দাম : দশ টাকা

সম্প্রদায় নিরপেক্ষ উন্নয়নের ডাক ফিরিয়ে দিল বিহার
পৃ: ১৭

স্বস্তিকা

মহারাষ্ট্রের তীর্থে তীর্থে
পৃ: ২১

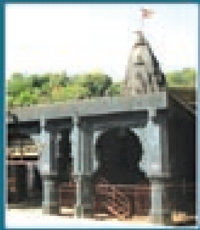

৬৮ বর্ষ, ১২ সংখ্যা।। ৭ ডিসেম্বর ২০১৫।। ২০ অগ্রহায়ণ - ১৪২২।। website : www.eswastika.com

নীতিহীনদের এই উল্লাস কতদিন ?

স্বচ্ছ ভারত গড়তে সন্ত সীতারামজীর ভারত পরিক্রমা

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ১২ সংখ্যা, ২০ অগ্রহায়ণ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

৭ ডিসেম্বর - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

জরুরি অবস্থার সুযোগ নিয়ে ইন্দিরা গান্ধী ‘সেকুলার’ ও ‘সোস্যালিস্ট’ শব্দ দুটি দেশের মানুষের ওপর চাপিয়ে দেন □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

খোলা চিঠি : সাহস বটে মেয়েটার □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

ভারতীয় ভাবানুভূতির সম্ভাব্য রূপায়ক সরকারের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণুতার অভিযোগ এক সুচতুর চক্রান্ত মাত্র □ দেবীপ্রসাদ রায় □ ১২

নীতিহীনদের এই উল্লাস ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য □ দিব্যজ্যোতি চৌধুরী □ ১৫

সম্প্রদায় নিরপেক্ষ উন্নয়নের ডাক ফিরিয়ে দিল বিহার □ সাধন কুমার পাল □ ১৭

মহারাষ্ট্রের তীর্থে তীর্থে □ নিমাই কুমার মুখোপাধ্যায় □ ২১

সংসদীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি ও ভারসাম্য রক্ষার সামঞ্জস্য একান্ত জরুরি □ জয় পণ্ডা □ ২৭

সাক্ষাৎকার : স্বচ্ছ গ্রাম থেকে স্বচ্ছ ভারত তৈরিতে নিরক্ষরকে অক্ষরদান করাটাই দায়িত্ব পালন : সীতারামজী □ ২৯

হিন্দু শাস্ত্রগুলির পুনঃঅধ্যয়ন প্রয়োজন □ ৩১

পুরুষের শুভাশুভ বৈশিষ্ট্য □ অশোক কুমার মণ্ডল □ ৩৬

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** □ **অঙ্গনা : ২৬** □ **অন্যরকম : ৩৩** □ **সুস্বাস্থ্য: ৩৫** □ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৭-৩৮**□ **রঙ্গম : ৩৯** □ **শব্দরূপ : ৪০** □ **চিত্রকথা : ৪১** □ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ধর্মনিরপেক্ষতা

‘সংবিধান দিবস’ উপলক্ষে সংসদের আলোচনায় সংবিধানের ৪২তম সংশোধনীর বিষয়টি উঠে এল। ওই সংশোধনীতে সংবিধানের প্রস্তাবনায় ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ ও ‘সমাজতান্ত্রিক’ শব্দ দুটি যুক্ত করা হয়েছিল। ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বরাবর অপব্যবহৃত হচ্ছে। এই ধর্মনিরপেক্ষতার ভাবনাটি এবারের বিশেষ বিষয়। এই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস ও ড. প্রণব চট্টোপাধ্যায়।

।। দাম একই থাকছে— ১০ টাকা।।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বারুদের স্তূপে পশ্চিমবঙ্গ

গত বছর বর্ধমানের খাগড়াগড়ে বিস্ফোরণের সময়ই সন্দেহ দানা বাঁধিয়াছিল। কলকাতার বন্দর এলাকা হইতে পাক গুপ্তচর সংস্থা আই এস আইয়ের এজেন্ট সন্দেহে তৃণমূলের তিন নেতা-কর্মীকে কলকাতা পুলিশ গ্রেপ্তার করিবার পরই শাসকদলের দেশবিরোধী যোগ স্পষ্ট হইল। কয়েকদিন আগে এই কলকাতাতেই আখতার খান ও তাহার ভাই জাফর খান গ্রেপ্তার হইবার পরে কলকাতায় পাক-গুপ্তচর বাহিনীর অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। সম্প্রতি বন্দর এলাকা গার্ডেনরিচ হইতে একই পরিবারের তিন সদস্যকে কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এস টি এফ) গ্রেপ্তার করিয়াছে। ধৃতদের অন্যতম ইরশাদ আনসারি তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন আই এন টি টি ইউ সি-র প্রভাবশালী সদস্য। গ্রেপ্তার করা হইয়াছে ইরশাদের পুত্র আসফাককেও। সে গার্ডেনরিচের হরিমোহন ঘোষ কলেজের তৃণমূল শাসিত ছাত্র সংসদের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক। ধৃত তৃতীয়ব্যক্তি ইরশাদের শ্যালক মহম্মদ জাহাঙ্গির। দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সংবেদনশীল গোপন ফৌজি নথি পাকিস্তানে পাচারের অভিযোগ এই তিনজনের বিরুদ্ধে রহিয়াছে। দেশদ্রোহের মামলা রুজু হইয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের মেরঠ হইতে ধৃত পাক-এজেন্ট ইজাজকে জেরা করিয়া সেই রাজ্যের গোয়েন্দারা কলকাতায় আই এস আইয়ের চক্রটির হদিশ পায় এবং কলকাতা পুলিশকে জানাইয়া দেয়। শুধু তাহাই নয়, পাকিস্তানি গুপ্তচর চক্রের সন্ধানে নামিয়া ইরফান আনসারি নামে আরও এক ব্যক্তির পরিচয় জানা গিয়াছে যে ইরশাদের সেজ দাদা। গোয়েন্দাদের দাবি আই এস আইয়ের নেটওয়ার্ক ছাড়িয়ে দেওয়ার মূল হোতা সে-ই।

ইরশাদের পরিবার যে বাড়িতে থাকিতেন সেই বাড়ির মালকিন কলকাতা পুরসভার তৃণমূলের মেয়র পারিষদ সামসুজ্জামান আনসারির ভাগিনেয়ী। এই বাড়ির সংশ্লিষ্ট এলাকায় ২০১২-র ৮ এপ্রিল শক্তিশালী বিস্ফোরণে দুইজন নিহত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে গোয়েন্দাদের অভিযোগ ছিল সামসুজ্জামানের লোকজন বিস্ফোরণস্থল ঘিরিয়া রাখিয়া বহু প্রমাণ লোপাট করিয়া দেয়। কেননা ওই ঘটনা মামুলি বিস্ফোরণ ছিল না বলিয়া গোয়েন্দারা অনেকাংশে নিশ্চিত ছিলেন।

আরও তাৎপর্যপূর্ণ হইল, খাগড়াগড়ে তদন্তে নামিয়া জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এন আই এ) জানিতে পারে, ওই বিস্ফোরণে নিহত বাংলাদেশের নাগরিক শাকিল গাজি দর্জির ভেক ধরিয়া বেশ কিছুদিন মেটিয়াবরুজেই ছিল। সে থাকিত ওই বিস্ফোরণ-স্থলের কাছেই এবং তাহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল সিমি-র লোকজন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, খাগড়াগড়ে যে বাড়ির দোতলায় ওই বিস্ফোরণ হয়, তাহার একতলায় ছিল তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়।

খাগড়াগড় কাণ্ডের সময় তৃণমূলের নেতারা দাবি করিয়াছিলেন, লোকসভা ভোটের সময়ে খাগড়াগড়ের ওই বাড়িতে দলীয় কার্যালয় করা হইলেও পরে তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। দায় ঝাড়িয়া ফেলিবার সেই ধারা এবারের চরকাণ্ডের পরেও অব্যাহত। বন্দর এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ (ববি) হাকিম এখন সৌদি আরবে এবং এই বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না বলিয়া জানাইয়াছেন। এইভাবে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল ও তাহার নেত্রী দায় এড়াইতে পারেন না। খাগড়াগড়ের পর এই ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। পশ্চিমবঙ্গ বিশেষত কলকাতা যে বারুদের স্তূপের উপর বসিয়া আছে—এই কথা ইতিপূর্বে স্বস্তিকায় বহুবার উল্লেখিত হইয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, ইহার পূর্বে ধৃত তিনজন সম্পর্কে কমপক্ষে তিনবার সতর্ক করিয়া দেওয়া হইলেও কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। ইজাজকে জেরা করিয়া যদি না জানা যাইত তবে এইসব জঙ্গিরা আরও কতদিন এইভাবে বহাল তবিয়তে নথি পাচারের কাজ চালাইয়া যাইত, তাহা যথেষ্ট উদ্বেগের। অবিলম্বে তল্লাশি চালাইয়া আই এস আইয়ের চরদের সমূলে উৎখাত করাই এখন সরকারের কাজ।

সুভাষিতম্

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ সামন্যমেতৎ পশুভির্নরানাম্।
ধর্মোহিতেষামধিকো বিশেষো ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।। —মনু সংহিতা

মানুষ ও পশু উভয়েরই আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন আছে। এছাড়া মানুষের বিশেষ করে যা আছে তা হলো ধর্ম। ধর্মহীন মানুষ পশুর সমান।

১৯ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ

বিহারে জঙ্গলরাজ প্রত্যাবর্তনের আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বিহারে জঙ্গলরাজের ইঙ্গিত মিলছে রাজ্যের নতুন মন্ত্রীসভাতেই। যে ২৯ জন মন্ত্রী শপথ নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ১৯ জনের বিরুদ্ধেই আদালতে ঝুলছে ফৌজদারি মামলা। যাঁর মধ্যে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার নিজেই। এদের অনেকেই খুন কিংবা খুনের চেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্ত। এমনকী কয়েকটি ক্ষেত্রে অপরাধ প্রমাণ পর্যন্ত হয়েছে, চার্জ গঠন পর্যন্ত হয়েছে কিন্তু দোষী সাব্যস্ত করার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি বলে মন্ত্রিত্ব বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। বলাই বাহুল্য এসব ক্ষেত্রে লালুপ্রসাদ যাদবের রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আর জে ডি)-এর মন্ত্রীরা সর্বাগ্রে রয়েছেন। যেমন রামবিচার রাইয়ের বিরুদ্ধে রয়েছে খুনের অভিযোগ। আবার সমবায় মন্ত্রী অলোক কুমার মেহতা, শ্রম মন্ত্রী বিজয় প্রকাশ দু'জনেই দাঙ্গা বাঁধানো, ঘুষ নেওয়া ও অন্যান্য অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত। তবে এব্যাপারে পিছিয়ে নেই নীতীশ কুমারের সংযুক্ত জনতা দলও। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী নীতীশও খুন ও খুনের ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত। অন্যদিকে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের সঙ্গে যুক্ত দুই মন্ত্রী জয়কুমার সিং ও খুরশিদ ফিরোজ আহমেদ দু'জনেই চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত। এর মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তিটির ক্ষেত্রে খুনের ষড়যন্ত্র, মহিলাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ইত্যাদি অভিযোগ রয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মোতাবেক নির্বাচনী হলফনামায় তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা এসব অভিযোগের কথা কবুল করেছেন বিহারের মন্ত্রীরা। এবং দু'টি নির্বাচনী নজরদার 'অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস' (এ ডি আর) এবং 'বিহার ইলেকশন ওয়াচ' (বি ই ডব্লিউ) এসব অভিযোগকে সংকলন করেছে। বিহারে ২০১২ সালে বিধানসভা কাউন্সিল নির্বাচনের সময় এক হলফনামায় তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের কথা উল্লেখ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার।

অভিযুক্ত লালু-তনয়দ্বয় তেজস্বী ও তেজপ্রতাপ

এছাড়াও বিহারের অন্যান্য যেসব মন্ত্রীরা অভিযুক্ত তাঁদের মধ্যে লালু-র দুই পুত্র উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব ও তেজপ্রতাপ যাদব তো রয়েছেনই। এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন শিবচন্দ্র রাম, চন্দ্রিকা রাই, সন্তোষকুমার নিরালা, চন্দ্রশেখর, মুনেশ্বর চৌধুরী, শরণ কুমার, অওধেশ কুমার সিং, শৈলেশ কুমার, আবদুল বারি সিদ্দিকি, মদন সাহানি এবং কপিলদেও কামাত। তবে এঁদের বিরুদ্ধে অপেক্ষাকৃত লঘু ধারার অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। যেমন আইন অমান্য, অপরাধভঙ্গ, স্বেচ্ছায় আঘাতের কারণ, বাড়ির মধ্যে অনৈতিক প্রবেশ, অপমান, জনসমক্ষে অপরাধকে প্রশ্রয়, অন্যায়ভাবে বন্দী রাখা ইত্যাদি।

এখন প্রশ্ন, যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে এবং বিহারবাসীর আস্থা ও ভরসার প্রতীক হিসেবে মহাজোট ক্ষমতায় এসেছে, তা রাখা আদৌ সম্ভব হবে কিনা। বিশেষ করে শাসকদলের অভিযুক্ত নেতা-মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক পদক্ষেপ কঠিনতর হয়ে যাবে এবং এদের বেকসুর যাবতীয় অভিযোগ থেকে মুক্তি পাবার সম্ভাবনা প্রবল। সেক্ষেত্রে বিহারে অপরাধ-প্রবণতা নতুন মাত্রা পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা দুর্নীতির আঁতুড়ঘর লালুপ্রসাদ যাদবের আর জে ডি বিহারের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হওয়ায় ফিরে আসবে এক দশক আগের জঙ্গলরাজ। এখন ক্ষমতার প্রলোভনে নীতীশ কতদূর তা সহ্য করেন, সেটাই দেখার।

সোনা কিনতে রেকর্ড ২৪৬ কোটি টাকা জমা দিলেন ৬৩ হাজার আবেদনকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বরাবরের মতো ধনতেরাস বা অক্ষয় তৃতীয়ায় সোনা কেনা নয়— পরিবর্তে গোল্ড বন্ড। সরকারের এই অভিনব প্রকল্পে সোনার বদলে গোল্ড বন্ড দেওয়া হবে। ন্যূনতম ২ গ্রাম থেকে সর্বাধিক ৫০০ গ্রাম সোনা এর মাধ্যমে কেনা যাবে। যে টাকায় কেনা হবে তার ওপর সরকার বছরে ২ বার ২.৭৫ শতাংশ সুদ দেবে। এই বন্ডটির মেয়াদ ৮ বছর। এর মধ্যে ৫ বছর পার হয়ে গেলে বাজারে বন্ডটি বিক্রি করা যাবে। উল্লেখ্য, মেয়াদ শেষে তাঁরা তাঁদের আট বছর আগে কেনা সোনা সেই দিনের বাজার মূল্যে (এক সপ্তাহের গড় দাম) সরকারের কাছ থেকে ফেরত পাবেন। একদিকে পূর্ণ নিরাপত্তা, সঙ্গে সুদ ও মেয়াদ পূর্তিতে মূলধন বৃদ্ধির এমন সুযোগ বড় একটা আসে না। এই সব বিবেচনা করেই অর্থনৈতিক বাজারে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। সরকার খেপে খেপে এই আবেদন নিতে থাকবে বলে খবর।

সেকুলারিজম্ রাজনীতিতে সব থেকে বেশি অপব্যবহৃত শব্দ : রাজনাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ‘সেকুলারিজম’ রাজনীতিতে সব থেকে বেশি অপব্যবহৃত শব্দ। গত ২৬ নভেম্বর সংসদে বি আর আম্বেদকরের ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং একথা বলেন। তিনি বলেন, সেকুলার ও সোশ্যালিস্ট শব্দ দুটি ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের প্রস্তাবনায় সন্নিবেশ করা হয়েছে। বিষয়টির বিরোধিতা না করলেও তিনি জানান, প্রস্তাবনা হলো সংবিধানের আত্মা। তার প্রস্তাবনায় কোনো পরিবর্তন সংবিধান প্রণেতাদের কাছে কাম্য ছিল না। তিনি আরও বলেন, সংবিধানের মূল আদর্শটি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ঐতিহ্য থেকেই নেওয়া হয়েছে এবং সেটা স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলস্বরূপ নয়। সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের মাধ্যমে প্রস্তাবনায় ভারতকে ‘Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic’ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ২৬ নভেম্বর, ১৯৪৯-তে এটা গৃহীত হলেও তা কার্যকরী হয় ২৫ নভেম্বর, ১৯৫০ সালে। সংবিধান প্রণেতারা ‘সেকুলার’ ও ‘সোশ্যালিস্ট’ শব্দ দুটি সংবিধানে সন্নিবেশ করেননি। কেননা ভারতীয় সভ্যতায় এইসব মূল্যবোধ আগে থেকেই ছিল। উল্লেখ্য, ২৬ নভেম্বর তারিখটি ‘সংবিধান দিবস’ হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত এনডিএ সরকার নিয়েছে।

ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের কাছে মোদীর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিদেশ সফরে গেলেই সেই দেশে বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূত এবং অনাবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে একযোগে মিলিত হন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথম নেপাল সফরে যান তিনি। সেখানেও দেখা গিয়েছিল একই ছবি। এরপর একে একে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, চীন, ইউকে এবং সম্প্রতি মালয়েশিয়ার অনাবাসী ভারতীয়দের সামনে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী। গত ২২ নভেম্বর কুয়ালামপুরে মালয়েশিয়ান আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী এবং কনভেনশন সেন্টারে বক্তব্য রাখেন নরেন্দ্র মোদী। শ্রোতার আসনে ছিলেন প্রায় ১৫ হাজারের বেশি অনাবাসী ভারতীয়। যাদের ‘মালয় ইন্ডিয়ান’ নামে সম্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই অনাবাসী ভারতীয়দের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যাঁরা হিন্দি একেবারেই বলতে পারেন না, ইংরাজিও খুব ভাঙাভাঙা শব্দে বলে থাকেন এরকম মানুষজন এসেছেন। কারণ তারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে খুবই কাছের মানুষ হিসাবে দেখেন। এবং প্রধানমন্ত্রী মোদী যে তাঁর প্রতিশ্রুতি পালনে বদ্ধ পরিকর তা কবিতা পালিসিমায়নের কথা শুনে বোঝা যায়। কবিতা এখন ছাত্রী। এসেছিলেন মোদীর শিক্ষা এবং পেশাভিত্তিক বিষয়ের উপর বক্তব্য শুনতে। সে জানায়, ‘আমি ভারতে কাজ করতে উদ্যোগী এবং মোদীর জমানায় দেশের যেভাবে উন্নতি হচ্ছে তাতে কাজের সুযোগও ক্রমশ বাড়ছে।’ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর ভাষণে তামিলভাষী মানুষদের স্বাগত জানান। তিনি বলেন, ‘প্রত্যেক ভারতীয়ের মধ্যে ভারতীয় সত্তা অবস্থান করে।’ ইউকে, ইউএস, দুবাই বিশ্বের যে প্রান্তেই থাকুক না কেন প্রত্যেক অনাবাসী ভারতীয়ের ‘প্যান ইন্ডিয়ান’ পরিচয় রয়েছে। যেখানে ভাষা কোনো ব্যাপার নয়।

এই অনাবাসী ভারতীয়রা প্রত্যেকেই ভারতের উন্নতি সাধনের সঙ্গে যুক্ত। ‘মালয় ইন্ডিয়ান’-দের কাছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পের অন্যতম পুরোধা।

উবাচ

“মাত্র কয়েকটা দেশের জীবনযাপনের ধারা নিশ্চয় বহু মানুষের জন্য আনন্দের সুযোগ নিয়ে আসে না।”

— প্যারিসে জলবায়ু পরিবর্তন শীর্ষ সম্মেলনে কার্বন নিঃসরণের বোঝা হালকা করার প্রসঙ্গে **প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।**

তসলিমা নাসরিন

“মোদী সরকার আসার বহু বছর আগেই আমি হায়দরাবাদে ব্যাপক মার খেয়েছি ও পশ্চিমবাংলা থেকে বিতাড়িত হয়েছি। থাকার কোনো ঠিকানা ছিল না। এ জিনিস ভারতে বহু যুগ ধরেই হয়ে আসছে। তবুও আমি কখনই ভারতকে অসহিষ্ণু দেশ বলে মনে করি না। আর আমিরকে তো তার দেশবাসী ভালবাসা উজাড় করে দিয়েছে। তাই আমিরের জায়গায় থাকলে আমি দূরতম স্বপ্নেও ভারত ছাড়ার কথা মাথায় আনতাম না। শেষ বিচারে তো ভারত অবশ্যই একটি সহনশীল দেশ।”

মীনাক্ষী লেখি

“গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি সরকারের ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করার জন্য পুরো পরিবেশটা তৈরি করা হয়েছে। তাই এদের আমি ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী বলি।”

প্রধানমন্ত্রী গ্রাম-সড়ক যোজনার কাজ শেষ ২০১৯-তেই

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০২২ নয়, ২০১৯-এর মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী গ্রাম-সড়ক যোজনার অন্তর্গত প্রস্তাবিত গ্রামীণ রাস্তাগুলির সংযুক্তিকরণের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করল কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। এর জন্য কেন্দ্র স্থির করেছে ২০১৫-১৬ আর্থিক বর্ষে রাজ্যগুলির প্রাথমিক বরাদ্দ ৫ হাজার কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫,১০০ কোটি করা হবে। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী বীরেন্দ্র সিং এক তথ্য পরিসংখ্যান উল্লেখ করে জানিয়েছেন রাজ্যগুলির জন্য এই কাজে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ২০১৩-১৪ আর্থিক বর্ষে ৫,১৯৬ কোটি টাকা। এর আগের বছর অর্থাৎ ২০১২-১৩ সালে তা ছিল ৪৩১৩ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ এটি পৌঁছে যায় ৯৯৬০ কোটি টাকায়। চলতি আর্থিক বছরে একাজে ৫০০ কোটি টাকারও বেশি বৃদ্ধি করা হবে। তিনি আরও জানান, ২০১২ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত ১৩,৫০০টি গ্রাম সংযুক্তের যে পরিকল্পনা ছিল তার সঙ্গে আরও ২৯ হাজার গ্রাম জুড়েছে। ২০১৫ থেকে ২০১৭-র মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে তাঁর আশ্বাস।

বীরেন্দ্র সিং

প্রাথমিকভাবে স্থির হয়েছিল যে ২০২২-এর মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ শেষ করা হবে। কিন্তু এখন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক ২০১৯-এর মার্চ মাসের মধ্যে এই কাজ শেষ করার পরিকল্পনা নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় প্রথম ১ লক্ষ ৭৮ হাজার ১৮৪টি গ্রামকে চিহ্নিত করা হয়েছিল বলে মন্ত্রক সূত্রের খবর। এর মধ্যে গত ১৫ বছরে ১,১২,৫৫০ টি গ্রামকে এই প্রকল্পের সাহায্যে সংযুক্ত করা গিয়েছে। যা মূল প্রকল্পের ৬৩ শতাংশ। বাকি ৩৭ শতাংশেরও সংযুক্তিকরণের কাজ দ্রুত শেষ করতে কেন্দ্র উদ্যোগী হয়েছে। এর ফলে গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নে বিপুল বিনিয়োগ আসবে বলে অর্থনীতিবিদরা মনে করেছেন। ফলে দেশের অর্থনীতিরও ঘুরে দাঁড়াবার সমূহ সম্ভাবনা।

এই কাজের জন্য কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের মানোন্নয়নের উপরও জোর দিচ্ছে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। এমনকী প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় তহবিল ভাগের ক্ষেত্রে কেন্দ্র-রাজ্য ৬০ : ৪০ অনুপাত অনুসরণ করে থাকে। তবে উত্তর-পূর্ব ভারতের ৮টি রাজ্য, ৩টি হিমালয় রাজ্যের ক্ষেত্রে এই অনুপাতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯০ : ১০। তহবিলের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের কোনো সমস্যা না থাকলেও অনেক রাজ্যের টালবাহানায় প্রকল্পটি বিলম্বিত হচ্ছে।

মুসলমান মহিলারাই মুসলিম ব্যক্তিগত আইন পরিবর্তনের দাবি জানালো

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে দেওয়া এক দাবিসনদে ভারতীয় মুসলিম মহিলা আন্দোলনের পুরোধা-রা তাঁদের প্রচলিত আইনের আশু পরিবর্তন চাইলেন। এই সংগঠনে বর্তমানে দেশব্যাপী ১৩টি রাজ্যে ৭০ হাজার সদস্য রয়েছেন।

ইতিমধ্যে সর্বোচ্চ আদালত National Legal Service Authority of India-কে 'মুসলমান মহিলাদের ওপর গুরুতর লিঙ্গ বৈষম্যের' কারণ দর্শাতে আদেশ দিয়েছে। এটি যে মৌলিক অধিকার ভঙ্গেরই সামিল সেই উল্লেখও আদেশে রয়েছে।

তাঁদের প্রদেয় আবেদনপত্রটিতে মুসলমান মহিলা প্রতিনিধিরা ফোরাম উদ্ধৃত করে বহুবিবাহকে বেআইনি ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তাঁরা সম্পত্তির সমান অধিকার ও ন্যায়বিচার পেতে পক্ষপাতদুষ্ট ১৯৩৯ সালের মুসলিম ম্যারেজ অ্যাক্ট বাতিল করা ও ১৯৩৭ সালের শরিয়তি আইনের বহু সংস্কারের দাবিতেও সোচ্চার হয়েছেন। পন্থ নিরপেক্ষতার পথে হয়ত এটি প্রথম কদম।

টাকার মহিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ১৯৯৭ সালে দিল্লীর দুই রিয়েল এস্টেট মাতব্বর সুশীল আর গোপাল আনমলের কেরামতিতে উপহার সিনেমা হল ভেঙে ৫৯ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। মামলার দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়ার পর সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি দুই ভাইকে অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলায় ২ বছর করে জেল দেওয়ার সঙ্গে জেল ফাঁকি দেওয়ারও একটি শর্ত দিয়েছে। প্রত্যেককে ৩০ কোটি অর্থে ৬০ কোটি টাকা দিল্লী সরকারের কাছে জমা দিলে বন্দী জীবনের হ্যাপা পোহাতে হবে না।

ইতিমধ্যে দুই ভাই প্রয়োজনীয় টাকা চটজলদি জমাও দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সিবিআই কর্তৃপক্ষ ও Association of victions of Uphar Tragedy (AVUT) এই রায়ে স্বভাবতই বিক্ষুব্ধ। তারা আদেশের পুনর্বিবেচনার দাবি করেছে। একেই বোধহয় কথায় বলে টাকার জোর!

গত ৩০ নভেম্বর কলকাতায় বিজেপির উত্থান দিবসের মঞ্চে (বাঁ দিক থেকে) দিলীপ ঘোষ, সুশান্ত পাল, কৈলাশ বিজয়বর্গীয় ও রাহুল সিন্‌হা।

ভুয়ো তথ্য দিয়ে সংসদকে অসহিষ্ণু করে তুললেন সেলিম

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কমিউনিস্টরা যে ভুয়ো তথ্য দেখিয়ে গলাবাজি করে থাকে সম্প্রতি লোকসভায় সিপিএমের মহম্মদ সেলিমের আচরণে তা আরও একবার প্রমাণিত হলো। গত ৩০ নভেম্বর লোকসভায় অসহিষ্ণুতা প্রসঙ্গে আলোচনায় একটি ম্যাগাজিন দেখিয়ে সেলিম অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং অসহিষ্ণু। 'নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর রাজনাথ সিং বলেছিলেন, ৮০০ বছর পর ফের একবার কোনো হিন্দু দেশের শাসক হলেন। এটাই কি গণতন্ত্র? এটাই কি ধর্মনিরপেক্ষতা?' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং সেলিমের এই অভিযোগের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, 'আমার দীর্ঘ সাংসদ জীবনে এত আঘাত কখনোই পাইনি। একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যদি এ ধরনের মন্তব্য করেন তাহলে তাঁর এই পদে থাকার কোনো অধিকার নেই। এই সংসদ এবং এই দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভালোভাবেই জানেন যে, তাঁর পক্ষে এ ধরনের মন্তব্য করা সম্ভব নয়।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আউটলুক ম্যাগাজিনে এই মন্তব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল। তথ্যগত ভুল স্বীকার করে ওই পত্রিকাটি তাদের অনলাইন সংস্করণে জানিয়েছে, আটশো বছর পরে দেশে হিন্দুশাসক আসার কথা বলেছিলেন অশোক সিংহল। রাজনাথ নন। প্রতিবেদনে ভুল তথ্য প্রকাশিত হওয়ার জন্য নিঃশর্ত ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছেন ওই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ।

বাল্যবিবাহে বিশ্বে দ্বিতীয় বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বাল্যবিবাহে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে বাংলাদেশ। সম্প্রতি এমনই এক তথ্য উঠে এলো 'বাংলাদেশ ইনেশিয়েটিভস ফর ম্যারেড অ্যাডোলেসেন্ট গার্লস এমপাওয়ারমেন্ট' (ইমেজ) নামক এক সংস্থার সমীক্ষায়। সংস্থার রিপোর্টে জানা যায়, বাংলাদেশে বিবাহ প্রতি ১০ জন কন্যার মধ্যে ৭ জনেরই বয়স ১৮ বছরের নীচে। গত ২০ নভেম্বর বিশ্ব শিশু দিবসে এই সংস্থার পক্ষ থেকে বিবাহিত কন্যাশিশু সপ্তাহ পালন করা হয়। আর সেখানেই এই পরিসংখ্যান তুলে ধরে সংস্থাটি। তবে এ ধরনের সমীক্ষা সামনে উঠে এলেও বাল্যবিবাহ রোধে সরকারের পক্ষ থেকে কোনোরকম উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি। কিন্তু বাল্যবিবাহ যে ক্ষতিকর তা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত এবং তা বন্ধ করতে উদ্যোগী এই সংস্থা। রিপোর্টে আরও জানা যায়, বাংলাদেশে প্রতিবছর ২৩ লক্ষ ৫৯ হাজার বাল্যবিবাহ হয়। শিশু বিবাহের সংখ্যার হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সংরক্ষণের সমাপ্তি ঘোষণা সুপ্রিম কোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। স্বাধীনতার ৬৮ বছর পরে সংরক্ষণ সংক্রান্ত এক যুগান্তকারী রায় ঘোষণা করলো সুপ্রিম কোর্ট। তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানার সুপার স্পেশালিটি মেডিক্যেল কোর্সে ভর্তি সংক্রান্ত যোগ্যতার মাপকাঠিকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সংরক্ষণের বিরোধিতা করে। বিচারপতি দীপক মিশ্র ও পিসি পন্থের বেঞ্চ জানিয়েছেন যে সুপার স্পেশালিটি কোর্সের ক্ষেত্রে প্রাথমিক যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে মেধাকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বারবার কেন্দ্র ও রাজ্যকে মনে করিয়ে দিলেও তা উপেক্ষিত থেকে গেছে।

সংবিধানে ‘সেকুলার’ শব্দটি জুড়ে দিতে নেহরু ড. আম্বেদকরের ওপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করেছিলেন

গত ২৫ নভেম্বর সংসদে সংবিধানের অন্যতম প্রধান রূপকার ড. বি আর আম্বেদকরের স্মরণসভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিং সঠিকভাবেই বলেছেন যে, সংবিধানের মুখবন্ধে (preamble) ‘সোশ্যালিস্ট’ এবং ‘সেকুলার’ কথা দু’টি প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থার সুযোগ নিয়ে অনৈতিকভাবে সংযোজন করেন। এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে সোনিয়া গান্ধী এবং বিজেপি-বিরোধী সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরা ক্রমাগত সমালোচনা করে চলেছেন। এই মিথ্যা অপপ্রচারে সত্যটি চাপা পড়ে গেছে। ইন্দিরা গান্ধী দেশে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন। জরুরি অবস্থা বলবৎ ছিল ১৯৭৭ সালের ২১ মার্চ পর্যন্ত। জরুরি অবস্থার দ্বিতীয় বছরের শেষদিকে ইন্দিরা গান্ধী সংবিধান সংশোধন করে বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও অধিকার খর্ব করার সিদ্ধান্ত নেন। এই উদ্দেশ্যে তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী স্বরণ সিংয়ের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি মুখবন্ধ-সহ প্রায় পুরো সংবিধানটি সংশোধনের সুপারিশ করে। এরপরেই ইন্দিরা সংবিধানের ৪২তম সংশোধন বিলটি সংসদে বিনা বাধায় পাশ করিয়ে নেন। তারিখটা ছিল ১৯৭৭ সালের ৩ জানুয়ারি। পরে জনতা সরকারের আমলে ৪৩ এবং ৪৪ তম সংশোধনী এনে ইন্দিরার করা সংশোধন বাতিল করা হলেও প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের ইচ্ছায় মুখবন্ধে ‘সোস্যালিস্ট’ এবং ‘সেকুলার’ কথা দু’টি রেখে দেওয়া হয়।

ইন্দিরার ৪২তম সংশোধনের আগে সংবিধানের মুখবন্ধে ছিল, ‘Sovereign democratic republic’ কথাটি। সংশোধন করে কথাটি লেখা হয়, ‘Sovereign Socialist Secular democratic republic’। এই কারণেই ৪২ তম সংশোধনের পর লোকে বলতে শুরু করে ‘এটি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন নয়। এটি ইন্দিরা কনস্টিটিউশন।’ এখানে একটি মৌলিক প্রশ্ন থেকে যায়। সংবিধানের ঘোষণা অনুসারে ভারত প্রকৃত অর্থে কি সমাজতান্ত্রিক দেশ? ইন্দিরা চেয়েছিলেন তখনকার সোভিয়েত দেশের ধাঁচে ভারতে কংগ্রেসের স্ট্যালিনিস্ট সোশ্যালিজম কায়েম করতে যা আদতে একনায়কতন্ত্র। তাছাড়া সংবিধানের মুখবন্ধ এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংশোধনের ক্ষমতা সংসদের বা প্রধানমন্ত্রীদের নেই। সুতরাং মুখবন্ধে সোশ্যালিস্ট এবং সেকুলার কথা দু’টি ঢুকিয়ে দেওয়া আইনের চোখে অবৈধ। সংসদ একমাত্র directive principles-এর ক্ষেত্রে সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে। তার বাইরে নয়। মুখবন্ধের ক্ষেত্রে তো নয়ই।

গূঢ় পুরুষের কলম

দুঃখের কথাটা হচ্ছে সংবিধান প্রণেতারা কেউই চাননি যে সংবিধানে সোশ্যালিস্ট এবং সেকুলার শব্দবন্ধ থাকুক। তাঁদের বক্তব্য ছিল গণতান্ত্রিক ভারতের সমাজ ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামো কী হবে সেই সিদ্ধান্ত জনসাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নেবেন। সংবিধান প্রণেতারা জনসাধারণের মতামত উপেক্ষা করে দেশের সমাজ ব্যবস্থার চরিত্রটি ঠিক করে দিতে পারেন না। সংবিধান রচনার প্রথম ধাপে যখন Constituent Assembly-তে বিতর্ক হচ্ছে তখন বিহার রাজ্যের প্রতিনিধি অধ্যাপক কে টি শাহ প্রস্তাব দেন, সংবিধানের মুখবন্ধে ‘Secular federal Socialist nation’ কথাটা রাখা হোক। ড. আম্বেদকর এর তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি প্রতিবাদে বলেন, ‘It cannot be laid down in the Constitution because that will destroy democracy altogether’। দেশের সামাজিক পরিকাঠামো স্থির করার অধিকার একমাত্র দেশের নাগরিকদের। অন্য কেউ তা ঠিক করতে পারে না।

একদা নিজ বাসভূমি থেকে বিতাড়িত ইহুদি এবং পারসীদের ভারতে আশ্রয় দেন এখানের হিন্দু নৃপতিরা। এই ঐতিহাসিক ঘটনা মাথায় রেখে সংবিধান প্রণেতারা সেকুলার কথাটা বাদ দেন। তাঁরা সংবিধানে হিন্দু আইডেন্টিটি রাখতে মূল খসড়ায় সনাতন ভারতের ২০টি যুগান্তকারী চিত্র যুক্ত করেন। এই ছবিগুলি ছিল শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কা বিজয়, ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গীতায় উপদেশ শোনানো, গঙ্গার মর্ত্যে অবতরণ, গৌতমবুদ্ধ, মহাবীর, ছত্রপতি শিবাজীর রাজ্যাভিষেক। তা ছাড়া ছিল রানি লক্ষ্মীবাই, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং গান্ধীজীর প্রতিকৃতি। অধিকাংশ ছবিই নন্দলাল বসুর আঁকা। কংগ্রেসী শাসকরা মূল খসড়ার সঙ্গে যুক্ত এইসব অমূল্য ছবিগুলি বাতিল করে দেয়। সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে যে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর নির্দেশে সংবিধানের হিন্দু চরিত্রটি মুছে ফেলা হয়। সংবিধানে ‘সেকুলার’ কথাটি জুড়ে দিতে নেহরু ড. আম্বেদকরের উপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু তিনি নেহরুর চাপের কাছে নতি স্বীকার করেননি।

তাই আজ যদি বলা হয় ভারতীয় সংবিধানে সোশ্যালিস্ট এবং সেকুলার কথা দুটি বেআইনি এবং অ-সাংবিধানিক, তবে তা মিথ্যা নয়। সংবিধানের মুখবন্ধের পরিবর্তন করার অধিকার ইন্দিরা বা (তৎকালীন) সংসদের ছিল না। তবু জরুরি অবস্থার অন্যায় সুযোগ নিয়ে ইন্দিরা গান্ধী সংবিধানের ৪২তম সংশোধন করে সেকুলার ও সোশ্যালিস্ট কথা দুটি দেশের মানুষের উপর চাপিয়ে দেন। ■

সাহস বটে মেয়েটার

তসলিমা নাসরিন
নয়াদিল্লী,

তসলিমা, আপনার সঠিক ঠিকানা সত্যিই জানা নেই। ফেসবুক ঠিকানাটা জানি। কিন্তু এই চিঠি তো সেখানে দেওয়া যাবে না। খোলা চিঠি যে! তাই নয়াদিল্লী বলেই ছেড়ে দিলাম।

মুসলমান মৌলবাদীদের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে মুখ খোলায় বাংলাদেশ ছাড়তে হয়েছিল আপনাকে। আপনার মুণ্ডু চেয়ে ফতোয়াও জারি হয়েছিল। তার পর থেকে ভবঘুরে জীবন কাটালেও 'বিদ্রোহী' সত্তা যে একটুমাত্র ছাড়তে পারেননি আপনি, তা ফের প্রমাণ হলো। ফেসবুকে একটি পোস্টে আপনি সরাসরি মসজিদ-মাদ্রাসা বন্ধ করার পক্ষে সওয়াল করে তসলিমা আপনি আমার কাছে আরও সাহসী হয়ে উঠেছেন। আপনার অনেক বক্তব্যের সঙ্গেই আমার মতবিরোধ থাকতে পারে। তবে এটা ঠিক যে আপনি সোজা কথা সোজা করে বলে দিয়েছেন। আপনার সহজ যুক্তি--- মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলি মগজধোলাইয়ের কাজে লিপ্ত। শিশুদের মাথায় জেহাদ ঢুকিয়ে তাদের সন্ত্রাসবাদের পথে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

গত ১৪ নভেম্বর আপনার ফেসবুক ওয়ালে ওই পোস্ট আপলোডের পর তো 'সেকুলার'দের মাথায় বাজ পড়েছে। মমতা-জমানানায় আপনার আর বাংলায় ফিরতে হচ্ছে না। কারণ, মসজিদ-মাদ্রাসা বন্ধ করতে বলার পাশাপাশি জেহাদি কার্যকলাপ ও তার প্রতি 'মেকি সহানুভূতি' নিয়ে কড়া সমালোচনাও করেছেন আপনি। বামপন্থীদেরও ছাড়েননি আপনি। আপনার গোটা

লেখাটা একবার উল্লেখ করে দিই। কারণ, খবরের কাগজগুলোও সাহস করে ছাপতে পারেনি। আপনি লিখেছেন, ''আমেরিকা আর ইউরোপ মিলে ইসলামি সন্ত্রাসী দলগুলোকে ধ্বংস করতে পারত, কিন্তু করেনি। যতদিন সন্ত্রাসী দল আর সন্ত্রাসের সূতিকাগারগুলো সম্পূর্ণ ধ্বংস না হচ্ছে, ততদিন সন্ত্রাস চলবেই। ততদিন আমরা মরব, পৃথিবীর সর্বত্র। কোনো দেশ আর নিরাপদ নয়। সপ্তম শতাব্দীর ইসলাম এই একবিংশ শতাব্দীতে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে। হাতে তাদের একবিংশ শতাব্দীর অস্ত্র, মস্তিষ্কে সপ্তম শতাব্দীর অজ্ঞানতা। বামপন্থীরা সব দোষ পাশ্চাত্যের দেশগুলোকে দেবে, বলবে ওদের কারণেই সন্ত্রাসী জন্ম নিয়েছে, বলবে অশিক্ষা, দারিদ্র্য ইত্যাদিই সন্ত্রাসী জন্মের মূল কারণ। সন্ত্রাসীদের জন্য তাদের সহানুভূতি উথলে উঠবে। আর কতকাল এসব হিপোক্রেসি দেখব! মসজিদ-মাদ্রাসা বন্ধ করার সময় এসেছে। ওয়াজ-খুৎবা বন্ধ করার সময় এসেছে। শিশু-কিশোরদের মগজধোলাই বন্ধ করার সময় এসেছে। ইন্টারনেটের সন্ত্রাসী সাইটগুলো বন্ধ করার সময় এসেছে। ইসলাম শান্তির ধর্ম— এই মিথ্যে প্রচারটা বন্ধ করার সময় এসেছে।" এখানেই শেষ নয়, মাদ্রাসায় কীভাবে শিশুদের মগজধোলাই করা হয়, তা বোঝাতে আপনি আবার একটি ভিডিও আপলোড করেছেন ফেসবুকে।

আপনার বক্তব্য অনুযায়ী, দারিদ্র্য কিংবা অশিক্ষা সন্ত্রাসবাদের আসল কারণ নয়। সুপরিকল্পিতভাবে মগজধোলাইয়ের জেরে মাদ্রাসায় জঙ্গি তৈরি হচ্ছে, এটাই দাবি আপনার। সামগ্রিকভাবে ইসলামই কাঠগড়ায় তুলেছেন। কারণ আপনার মতে, ইসলাম শান্তির কথা বলে না! যদিও ইসলাম শব্দের অর্থই হলো 'শান্তি'। প্যারিসে জঙ্গি হামলার পর আপনার এই বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরে ফেসবুক, টুইটারে কম জলঘোলা হয়নি। সত্যি বললে মনে হয় এমনটাই হয়। আপনি যে কথাগুলো বলেছেন তা রাজনীতিকরা জানেন না এমন নয়। তবে বুকের পাটা নিয়ে বলতে মানা। সংখ্যালঘু ভোট যে বড় জুজু!

—**সুন্দর মৌলিক**

ভারতীয় ভাবানুভূতির সম্ভাব্য রূপায়ক সরকারের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণুতার অভিযোগ এক সুচতুর চক্রান্ত মাত্র

দেবীপ্রসাদ রায়

বহু প্রতীক্ষিত জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা ভাবানুভূতির রূপায়ণোন্মুখ এক কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত সুচতুর এই অসহিষ্ণুতার অভিযোগ। ক্ষমতা ভোগ করা থেকে দূরে থাকায় অনভ্যস্ত এবং ক্ষমতায় ফিরতে মরিয়া কংগ্রেসের রাজনৈতিক স্বার্থে তারই দীর্ঘকাল অনুগৃহীত, প্রসাদপুষ্ট একশ্রেণীর ভণ্ড সেকুলার ও মেকলে আদর্শে নিবেদিত-প্রাণ বুদ্ধিজীবী এই 'অসহিষ্ণুতা' আন্দোলনের উদ্যোক্তা এবং প্রাথমিক পরিচালক। ভারতের প্রকৃত ইতিহাসকে বিকৃত করে ভারতবাসীকে হীনমন্যতা-বোধের মেকলিয় চক্রান্তকে সফল করে তুলে বিজাতীয় পাশ্চাত্য কমিউনিস্ট প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করাই এই ভণ্ড সেকুলার এবং বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্য। ভারতীয় পরম্পরা বজায় রাখার জন্য তৃষিত ভারতবাসী এই কৃত্রিম 'অসহিষ্ণুতা' আন্দোলনের ফাঁদে যেন কোনো ভাবে পা না দিয়ে ভারতীয়তায় সম্পৃক্ত এক সরকারের ক্ষতি সাধনের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে পড়ে তার জন্য সদাসতর্ক থাকতে হবে। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং আই সি এইচ আর [Indian Council of Historical Research] দ্বারা লালিত পালিত এই বুদ্ধিজীবীদের ক্ষতিকারক ভূমিকার কথা দেশবাসী যেন ক্ষণিকের জন্যও বিস্মৃত না হয়। কতগুলি প্রশ্নের উত্তর খুঁজলেই এই আন্দোলনের স্বরূপ এবং উদ্দেশ্য ধরে ফেলা যায়।

> **ভারতের প্রকৃত ইতিহাসকে বিকৃত করে ভারতবাসীকে হীনমন্যতা- বোধের মেকলিয় চক্রান্তকে সফল করে তুলে বিজাতীয় পাশ্চাত্য কমিউনিস্ট প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করাই এই ভণ্ড সেকুলার এবং বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্য। ভারতীয় পরম্পরা বজায় রাখার জন্য তৃষিত ভারতবাসী এই কৃত্রিম 'অসহিষ্ণুতা' আন্দোলনের ফাঁদে যেন কোনো ভাবে পা না দিয়ে ভারতীয়তায় সম্পৃক্ত এক সরকারের ক্ষতি সাধনের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে পড়ে তার জন্য সদাসতর্ক থাকতে হবে।**

(১) বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী লেখক কলবুর্গির হত্যা হয়েছিল কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে, দাদরি কাণ্ড ঘটেছে সমাজবাদী দল শাসিত উত্তরপ্রদেশে। আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের বিষয়। রাজ্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ-বিক্ষোভ আন্দোলন হলো না কেন? কেন্দ্রীয় সরকারকে লক্ষ্যবস্তু করা হলো কেন?

(২) সাহিত্য আকাডেমি বা অন্য কেন্দ্রীয় সংস্থার পুরস্কার ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, হচ্ছে কেন? কোন্ যুক্তিতে?

শাসক বৃটিশের মিলিটারির হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ 'নাইটহুড' উপাধি ত্যাগ করেছিলেন।

আজকের উপাধি ত্যাগ বা পুরস্কার ফিরিয়ে দেওয়া কি 'নাইট' ত্যাগের সমান্তরাল? তাঁরা সব রবীন্দ্রনাথ হয়ে তৃপ্তিলাভ করতে পারেন?

(৩) কিছুকাল আগে জয়পুরে সাহিত্য সম্মেলনে সলমন রুশদিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তা ফিরিয়ে নেওয়া হলো বিশেষ জনগোষ্ঠীকে তুষ্ট রাখতে।

বুদ্ধিজীবীরা, সাহিত্যিকরা কী করেছিলেন এই অসভ্য অগণতান্ত্রিক কাজের বিরুদ্ধে?

তসলিমা নাসরিনও একই অগণতান্ত্রিক কাজের শিকার হয়েছিলেন। সবাই জানে কংগ্রেসি ও সিপিএম ব্যবস্থাপনায় দাঙ্গা লাগিয়ে তসলিমাকে কার্যত পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া করা হয়েছিল। বিশেষত সেকুলার বুদ্ধিজীবীরা কি ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী হয়েছিলেন?

(৪) দেগঙ্গা ও মাঝেরহাটে যে নারকীয় অত্যাচারের সম্মুখীন হলেন স্থানীয় হিন্দুরা তখন এই সব ভণ্ড সেকুলার ও বুদ্ধিজীবীদের মুখ খুলতে দেখেছিল দেশবাসী?

(৫) সলমন খুরশিদ তখন কেন্দ্রীয়

আইনমন্ত্রী। আন্দোলনরত অরবিন্দ কেজরিওয়াল উত্তরপ্রদেশে প্রচারে যাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আইনমন্ত্রী খুরশিদ ঘোষণা করেছিলেন কেজরিওয়াল উত্তরপ্রদেশ যেতে পারেন কিন্তু ফিরতে পারবেন না। এই ভণ্ড সেকুলার বুদ্ধিজীবীরা কী যোগনিদ্রায় অভিভূত ছিলেন?

(৬) শিখ দাঙ্গার নায়ক কংগ্রেসের এবং তার অনুগৃহীত বুদ্ধিজীবীদের এতবড় গলা কেন?

(৭) কাশ্মীর থেকে লক্ষ লক্ষ হিন্দু পণ্ডিত বিতাড়িত হয়ে উদ্বাস্তু জীবন কাটাচ্ছেন। এইসব বুদ্ধিজীবীদের কোন ভূমিকা ছিল মানবতার স্বার্থে? সেকুলারিজম-এর নামাবলী গায়ে এদের মতো অন্য কোথাও সাম্প্রদায়িক আছে কি? পেট্রোডলারের কী এমন নির্লজ্জ মহিমা!

(৮) কাশ্মীরে হজরৎবাল মসজিদের ঘটনা মনে আছে? গুজব ছড়ানো হলো হজরতের 'কেশ' চুরি হয়েছে। ব্যস্ দাঙ্গা চাপানো হলো হিন্দুদের উপর। তদন্ত হলো— 'কেশ' আদৌ চুরি হয়নি। কে গুজব রটালো— তদন্তের ফল চেপে দেওয়া হলো! বোধহয় 'মঙ্গলগ্রহ'র মানুষরা রটিয়েছিল। এই সব মান্যতাপ্রাপ্ত বুদ্ধিজীবীদের কোনো প্রতিক্রিয়ার কথা জানে কেউ? মসজিদের ইমামদের স্বার্থে চেপে দেওয়া হয়েছিল।

১৯৮৩ সালে তাঁর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া এক সংখ্যালঘু প্রতিনিধি দলকে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, "Minority can not claim to be safe by Constantly initating the majority." সংখ্যালঘু তোষণের ক্রমবর্ধমানতায় এবং দেশজুড়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অত্যাচারে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী নীতির ফলে প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তায় সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে, আজকের কৃত্রিম মিথ্যা অসন্তোষের বুকনি দিয়ে তা রোখা যাবে না,— এটা ইন্দিরা গান্ধীও বলেছিলেন।

ঠিক এই সময়ে ভণ্ড সেকুলার বুদ্ধিজীবীদের মাঠে নামিয়ে দেশবাসীর মাথায় অসহিষ্ণুতার কলঙ্ক লেপন করছে কংগ্রেস সোনিয়া গান্ধীর কর্মসূচি মতো। ঠিক যেমনটা করেছিল বৃটিশ শাসনের প্রথমদিকে দলে দলে পাদরিরা বিভিন্ন চার্চের নির্দেশে, খৃষ্টধর্ম প্রচারের কার্যসূচিতে। স্বভাবসহিষ্ণু হিন্দুদের উপর এই আক্রমণ ও অপপ্রচার দেখে অবশেষে কলম ধরেছিলেন রাজা রামমোহন, "It is well known to the whole world that no people on earth are more tolerant than the Hindoos, who believe all man to be equally within the reach of Divine beneficense, which embraces the good of every religious sect or denomination." [The Brahminical Magazine : Preface to the Second edition] এই হিন্দুরাই এদেশে প্রথম মসজিদ ও চার্চ স্থাপন করতে দিয়েছিল। আর এই ঔদার্য কী পেয়েছে পরবর্তীকালে? ব্যাপক হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্মান্তকরণ, ধর্ষণ, মন্দির ধ্বংস আর আজ দেশজুড়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাস, মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদের পরও! উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এক বৃহদংশ ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতাবাদের শিকার! বৃটিশ প্রকল্পিত 'Divide and rule' এখনো চলছে। অসহিষ্ণু হওয়ার কারণ থাকলেও তুলনামূলকভাবে অনেক সহিষ্ণু হিন্দুরা আজ নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে 'অসহিষ্ণুতা'র কলঙ্কছাপ দেশবাসীর গায়ে লাগাতে চক্রান্ত চলছে বিশ্বের কাছে গোটা ভারতকে হতমান করতে।

বর্তমানের এই চক্রান্ত শুরু হয়েছে উপরাষ্ট্রপতিকে দিয়ে। তিনি, হামিদ আনসারী মুসলমানদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ করছেন। কিন্তু তার ভিত্তি আছে কোনোরকম? তিনি উপরাষ্ট্রপতি হন কী করে মুসলমান হয়ে? কী করে ইতিপূর্বেই দু'জন রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন মুসলমানগোষ্ঠী থেকে, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিও। পৃথিবীর কোন্ দেশে সংখ্যালঘুদের এই মান্যতা দেওয়া হয়েছে সমান্তরালভাবে? এই কংগ্রেসী চক্রান্তকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীরা, তাদের অনুগামীরা। এঁরা একবারও ভেবে দেখছেন না স্বভাব সহনশীলতার কালান্তর ব্যাপী যে ঐতিহ্য আছে হিন্দুদের তার উপর অতিরিক্ত চাপ দেবার ফল কী হতে পারে? কী হয়েছিল গত শতাব্দীর নব্বই-এর দশকে?

দেশবাসীর এই ভণ্ড সেকুলার বুদ্ধিজীবীদের সম্বন্ধে সাবধান থাকতে হবে। ভারতকে হতমান, হীনমন্যতাবোধে আচ্ছন্ন করতে এরা সদা তৎপর। এদের জন্যই মিথ্যা আর্য আক্রমণতত্ত্বের ভারে ভারাক্রান্ত রাখা হয়েছে ভারতের ইতিহাসকে। খৃষ্ট পূর্বাব্দ চার হাজার বছর আগে পৃথিবীর সৃষ্টি— এই সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক আজগুবি তত্ত্বকে সামনে রেখে বেদ, বেদান্ত, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের সময়কাল নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশ্চাত্য বিদ্বজ্জনেরই অনেকের প্রবল আপত্তিতে ম্যাক্সমুলারের এই তত্ত্ব অসার প্রমাণিত হয়। ম্যাক্সমুলার নিজেও তাঁর ভুল স্বীকার করেন। শুধুমাত্র কমিউনিস্ট স্বার্থ চরিতার্থ করতেই ওই তত্ত্ব-র অন্ধ সমর্থন! এমনকী ২০০৩ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন থেকে ঘোষিত সিদ্ধান্ত যে আর্য আক্রমণ তত্ত্ব মৃত এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য তদনুযায়ী ইতিহাস লিখতে হবে--- তা সত্ত্বেও এইসব বুদ্ধিজীবীরা আর্য আক্রমণ তত্ত্বেই অটল থাকেন। শুধু তাই নয়, যে বৈদিক সরস্বতী নদীর এককালীন অস্তিত্ব বিপুল পরিমাণ গ্রন্থসাপেক্ষে এবং পরে আধুনিক উপগ্রহ চিত্র দ্বারা (ল্যান্ড স্যাট ও স্পট উপগ্রহ) সমর্থিত হলেও ইসরো (ISRO) বার্ক (Bark) অনুধাবন প্রত্নতাত্তিক, ভূতত্ত্ববিদ, হিজবাই বিজ্ঞান ইত্যাদির নানাদিক থেকে সমর্থিত হলেও— ইরফান হাবিব, রোমিলা থাপার প্রমুখ দ্বারা সরস্বতী নদী কাল্পনিক এবং হিন্দুত্ববাদীদেরই দ্বারা মিথ্যা প্রচারিত বলে দাবি করে চলেছেন। এমনকী কোনদিক থেকেই প্রামাণিক সমর্থন না মেলায় রোমিলা থাপার লিখেছেন— "The theory of the indegenous origin of Aryans in India was emphasised by a particular Indian nationlism seeking to supersede much of the earlier scholarly arguments. Some of the arguments to support these theories tend to set aside scholarly analysis and focus on the claims being made." [India : His-

torical Beginings and the concept of the Aryan. National Book Trust, India] এই Scholarly analysis এর ভিত্তি কী? না বাইবেল বর্ণিত পৃথিবীর সৃষ্টি কাল, ম্যাক্সমূলারের সম্ভবত, আনুমানিক শব্দসমূহ থেকে গৃহীত? প্রত্নতত্ত্ববিদ মার্কঅরেলস্টাইন যিনি সরস্বতী নদী নিয়ে অনুসন্ধানের সূচনা করেন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে, 'Particular Indian Nationalism'-র প্রতি তাঁর কোনো দায়বদ্ধতা ছিল? ফরাসি ভূতত্ত্ববিদ লুইস ভিভিয়ান দ্য সেন্টমার্টিন যিনি ভারতের ভৌগোলিক বিবরণ তৈরি করেছিলেন তাঁর কোনো দায়বদ্ধতা ছিল? আর একজন ফ্রেঞ্চ প্রত্নতত্ত্ববিদ Salomon Reinach ১৮৯২ সালে বিবৃতি দিয়েছেন— "To speak of an Aryan race of three thousand years ago is to put forward a gratuitous hypothesis, but to speak of it as if it still existed today is quite simply absurd." —কোন দায়বদ্ধতা ছিল?

পণ্ডিত কীথ বলেন, সপ্তসিন্ধু তীরেই বেদসমূহ রচিত হইয়াছে অন্যত্র কোথাও নহে [Religion and philosophy of the Vedas-Harvard Oriental studies No. 31]। পণ্ডিত Muir বলেছেন, "প্রথমেই আমি অকপটে স্বীকার করিতেছি যে যতদূর আমি জানি কোনো সংস্কৃত পুস্তক এমনকী অতি প্রাচীন পুস্তকের মধ্যেও এমন কোনো তথ্য বা ইঙ্গিত নেই যে আর্যগণ বিদেশীয় বংশোদ্ভূত [Original Sanskrit texts Vol. II p. 332]। এই আর্য আক্রমণ তত্ত্বে সরস্বতী নদী অস্তিত্বের ঠাঁই নেই। অতএব যত অকাট্য প্রমাণই থাকুক না কেন ইরফান হাবিব, রোমিলা থাপার প্রমুখের ধারণা সরস্বতী নদী হিন্দুত্ববাদীদের কাহিনি প্রসূত।

দু'টি মূল্যবান মন্তব্যের কথা উল্লেখ করে এই প্রবন্ধ শেষ করা যেতে পারে। (১) মেগাস্থিনিস যিনি খৃষ্টপূর্বাব্দ (অনুমানমত) চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীস থেকে মৌর্যদের সভায় পাটলিপুত্রে এসেছিলেন। তাঁর বিবরণীতে আছে :

"All Indians are free and none of them is a slave... Indians neither invade other peoples nor do other peoples invade India... They fare happly, because of their simplicity and their frugality.... Further they respect alike virtue and truth.

[The Invasion that never was : Michel Danins]

আবার খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থবিদ Richard Feynman তাঁর ত্রিনিদাদ ভ্রমণ প্রসঙ্গে লিখেছেন সেখানকার ভারতীয়দের জীবনযাত্রা সম্পর্কে তাঁর নিগ্রো ড্রাইভারের কাছে খোঁজ নিয়ে। নিগ্রো ড্রাইভারটি বলেছে— "...The Indian people are just as poor and sometimes even poorer than the Negro people, But they are getting somewhere, somehow... why is that ?" Feynman উত্তরে বলেন— "There's a long tradition behind life in India that comes from a religion and philosophy that is thousands of years old. And although these people are not in India they still pass those traditions about what's important in the–trying to build for the future and supporting their children in the effort which have come down for centuries." দেশবাসী নিয়মেই 'কালাপাহাড়ি' প্রয়াস থেকে দেশ ও নিজেদের রক্ষা করবে দৃঢ়তার সঙ্গে অপপ্রচারের জাল ছিন্ন ভিন্ন করে।

(লেখক বাঁকুড়া খৃষ্টান কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক)

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০টাকা

অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬

দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

নীতিহীনদের এই উল্লাস ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী

দেশজুড়ে প্রচার চালানো হচ্ছে যে সম্প্রতি বিহার নির্বাচনে জনগণ বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তার তলানিটুকুও আর পড়ে নেই। তার সঙ্গে বেশ কিছু সংবাদ পরিবেশক সংস্থার অভিমত যে বিহারে বিজেপিকে গোহারা হারিয়ে মহাজোটবন্ধন ঐতিহাসিক (!) জয় পেয়েছে। সেই উপলক্ষে ক্ষমতার পচা-গলা মৃতদেহকে ঘিরে গৃধ্রকুলের (শকুন) উল্লাস নজর কাড়ার মতো।

বিহারে কি সত্যিই তাহলে অশুভ শক্তির জয় হলো? নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া এটা মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। এবার নিয়ে নীতীশকুমার পঞ্চমবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন। গত একদশক ধরেও তিনি বিহারের ক্ষমতায় ছিলেন। তিনি নাকি বিহারের উন্নয়নের জন্য অনেক কাজ করেছেন। কিন্তু ইউপিএ সরকার চালিত ২০১১ সালের আর্থসামাজিক সমীক্ষা অন্য কথা বলছে। সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় সমস্ত মাপকাঠিতে বিহার ভারতের দরিদ্রতম ও অনুন্নত রাজ্যগুলির মধ্যে অগ্রণী। স্বাভাবিক কারণেই তাঁর ভয় ছিল এবার হয়তো জনগণ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করবে। তিনি এতটাই ভীত ছিলেন যে, নীতির তোয়াক্কা না করে তাঁর জাতশত্রু লালুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফেললেন। বিগত ২০ বছর ধরে পরস্পরের মুখ দেখাদেখি বন্ধ ছিল। তাছাড়া লালুপ্রসাদ একজন সাজাপ্রাপ্ত দাগি আসামি। বিজেপিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি লালুর 'জঙ্গলরাজের' অবসান ঘটিয়েছিলেন। তাই অত্যন্ত নীচ পন্থায় এবার ক্ষমতা ধরে রাখলেও নীতিশ্রেষ্ঠ (নীতীশ) বিহার রাজ্যের চূড়ান্ত নৈতিক পতন হলো। একশোজন বিহারবাসীর মধ্যে মাত্র ১৬-১৭ জন তাঁর সরকার চেয়েছে মানেই সিংহভাগ বিহারিজনতা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে একথা প্রমাণ করার জন্য যুক্তি অবতারণা করার দরকার নেই। অন্যদিকে বিহারের মসনদ থেকে অনেক দূরে চলে গেছিলেন লালুপ্রসাদ। পশু-খাদ্য মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাংসদ পদও খোয়াতে হয় তাঁকে। তার উপর ছিল বিগত লোকসভা ভোটে তাঁর ভরাডুবি। তাই সাময়িকভাবে প্রাণ ফিরে পাওয়াটা তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সুতরাং নীতীশের সঙ্গে যাওয়া ছাড়া তাঁর অন্য কোনো গতি ছিল না। মাত্র পাঁচ ভাগের একভাগেরও কম মানুষের রায় নিয়ে তিনি ক্ষমতার অলিন্দে এলেন। আর রাহুল গান্ধীর কথা কহতব্য নয়। শুধু লোকসভা ভোট কেন, এযাবৎ যে নির্বাচনেই তিনি কংগ্রেসকে নেতৃত্ব দিয়েছেন সেখানেই দলের গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়েছে। তাই গান্ধী পরিবারের (কংগ্রেসের) অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য তিনি এতটাই মরিয়া যে সমস্ত লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনাকে জলাঞ্জলি দিয়ে লালু-নীতীশের দুয়ারে ভিক্ষাপ্রার্থী হলেন। কিছুদিন আগেই দাগি লালুকে বাঁচাতে মনমোহন সরকারের আনা অধ্যাদেশ ছিঁড়ে ফেলার ডাক দেওয়া রাহুল পরমমিত্রতায় লালুর সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ হলেন এ ছবি ভারতবাসীর কোনোদিন ভোলা উচিত নয়। দুর্নীতিগ্রস্ত ইন্দিরা সরকারকে দেশ থেকে উৎখাত করার আন্দোলনের নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ-এর শিষ্য লালু-নীতীশ সেসব কথা আর মাথায় রাখলেন না। এক কথায় অসম্ভব একটি জোটের অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল

বিহারবাসী নিরুপায় ভাবে দেখল। ২৭ খানা আসনে জয়লাভ করে রাহুল লাগাতার ভাবে বিজেপি আর সঙ্ঘের বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্য করতে শুরু করেছেন। নিতান্ত কচিকাঁচা রাজনীতিক হলেও তাঁর এই ন্যূনতম জ্ঞান থাকা প্রয়োজন যে শুধু লালু-নীতীশ কেন, তাঁকে রাজনীতি করার জন্য কেউই তাঁর পায়ের তলার মাটি শক্ত করে দেবেন না। মাত্র ৬.৮ শতাংশ ভোট পেয়ে ২৭ খানা আসন দখল অঙ্কের বিচারে অলীক ও অবাস্তব। তাই শূন্যে দুর্গ রচনা করে তিনি দাবি করতে পারেন যে কংগ্রেস আবার তার হারানো জমি ফিরে পেতে শুরু করেছে। তবে সে দাবি করতে গিয়ে পাগলেও অন্তত দুবার ভাববে।

আলাদাভাবে লড়ে মহাজোটের শরিকরা ২০১৪ সালের নির্বাচনে যে ভোট পেয়েছিল তার যোগ তখন ছিল ৪৫ শতাংশের আশেপাশে। এবারের ভোটে তারা পেয়েছে

৪২ শতাংশ ভোট। বিজেপি লোকসভার তুলনায় প্রায় ৩ শতাংশ বেশি ভোট পেয়ে দল হিসেবে তারাই ভোট শতাংশে সর্ববৃহৎ (২৪.৮)। অর্থাৎ ঘুরিয়ে বললে ব্যাপারটা এরকম দাঁড়ায় যে, বিহারবাসীর রায়কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পাটিগণিতের মারপ্যাঁচে জোট ক্ষমতা দখল করল।

কতটা নিরাপদ হলো এই জোট সরকার? নীতিশ রাজা হলেন বটে, কিন্তু রাজত্বের আসল চাবিকাঠি রয়ে গেল চরমশত্রু লালুর হাতে। বিজেপিকে জোটসঙ্গী পেয়ে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলাকে শান্ত রাখতে নীতিশকে এর আগে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। লালুর অর্ধশিক্ষিত দুই ছেলে সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হলো। স্যোসাল মিডিয়ার দৌলতে তাদের নগ্ন ও বর্বর ছবি ইতিমধ্যেই দেশবাসী দেখে ফেলেছে। তারাও যে কমবেশি আসামি রক্তবহনকারী তার নমুনা মিলতে শুরু করেছে। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার সাতদিনের মধ্যে পাটনাতে তিনটি গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই বৈশালী, বেগুসরাই, দ্বারভাঙ্গা, ভাগলপুর মধুবনী, গয়া এবং সাসারাম জেলায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির এত অবনতি হয়েছে যে অবস্থা সামাল দিতে খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে মাঠে নামতে হয়েছে। এবার 'জঙ্গলরাজের' সমস্ত কুকর্মের দায়ভার তাঁকেই বইতে হবে। আর মোক্ষম বাগে পেয়ে লালু তাঁর চিরশত্রুকে শেষ করে দিতে যে সমস্ত রকম চেষ্টা চালাবেন তা না বললেও চলে। শপথ নেবার আগেই তা বোধহয় আঁচ করতে পেরেছেন নীতীশ। লালুর চরম আপত্তি সত্ত্বেও মোদীকে তাঁর শপথ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর মধ্যে আগামীতে তাঁর (নীতীশের) এনডিএ-তে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনার একটা আবছা ছবি দেখতে পাওয়া রাজনৈতিক মহলে এ নিয়ে একটা চাপা গুঞ্জনও শুরু হয়ে গেছে। তবে রাজ্যে রাজ্যে ভোটসর্বস্ব আঞ্চলিক নেতারা বিজেপিকে ঠেকাবার মোক্ষম অস্ত্র পেয়ে আনন্দে মশগুল। 'দুর্নীতিরানি' মমতাদেবী এই জোটের পৃষ্ঠপোষক হবার কারণে আবারও রাহুল গান্ধীর কাছে আসতে শুরু করেছেন। আর বঙ্গে কংগ্রেস-তৃণমূল জোট মানে এবার দু'দলের বেশ কিছু কর্মীসমর্থকরাই নয়, নেতা-নেত্রীদের একটা অংশ বিজেপি এবং মুকুল রায়ের নবনির্মিত দলের সঙ্গে চলে যেতে পারে এমন সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই তাঁদের কাছে বেশি উচ্ছ্বসিত হবার কারণ থাকছে না। অন্যদিকে দিল্লীতে শুধুমাত্র একটি নির্ভয়া ধর্ষণ আর ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা প্রতিশ্রুতিকে সম্বল করে ক্ষমতায় আসা কেজরি-সাহেব নিজেই পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও দুর্নীতি নিয়ে জেরবার। মহাজোটের আনন্দযজ্ঞে নিজেকে সামিল করে তিনিও দমবন্ধ করা পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে যে কোন বিবেচনায় স্বচ্ছতার ঝাড়ুধারী অরবিন্দ সাহেব দাগী আসামি লালুকে জড়িয়ে ধরলেন। এখন তিনি সাফাই দিতে ব্যস্ত যে তিনি নন, লালুজীই তাঁকে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

এবার আসা যাক জাতীয় রাজনীতির প্রসঙ্গে। ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি বিরোধী জোটের যে একটি আভাস পাওয়া গেল তাকে কিন্তু কোনোমতেই অকংগ্রেসী বলা যাবে না। বিহার নির্বাচনে অবিজেপি জোটের মহড়ায় কংগ্রেসের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেসই লালু-নীতীশ সম্পর্কের ফাটলে আঠার কাজ করল। এই জোটের রূপরেখা ইউপিএ না তৃতীয় ফ্রন্ট হবে সেটা সময়ই বলতে পারবে। এখানে কিন্তু বিস্তর সমস্যা রয়ে গেল। রাহুল-মমতা-লালু-নীতীশ-কেজরিওয়াল এঁদের প্রত্যেকেরই পাখির চোখ প্রধানমন্ত্রিত্ব। রাজীব গান্ধীর পর গান্ধীপরিবারের কেউ প্রধানমন্ত্রী হননি এটা কংগ্রেসী রাজনীতির দুর্বলতম প্রদর্শন। এবার কংগ্রেসে সেই স্রোত ফিরিয়ে আনতে রাহুল মরিয়া। তাঁকে যাতে ২০১৯ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তুলে ধরা হয় সেই প্রত্যাশায় রাহুলবাবু আঞ্চলিক দলগুলিকে দেদার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। একদা প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রশ্নে নীতীশ এনডিএ ছেড়েছিলেন। ওদিকে মমতাদেবী তাঁর ভাইপোকে বঙ্গের সিংহাসনের বসানোর পরিকল্পনা করে দিল্লীর পথে পা বাড়িয়ে বসে আছেন। কেজরিসাহেব তো প্রধানমন্ত্রীর দৌড়ে সামিল হবার জন্য কংগ্রেসের সাহায্য নেওয়া সরকার ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। এছাড়া রয়েছে ছোট-বড় শরিকদলের এমন অনেক নেতা-নেত্রী যাঁরা নিজেদের প্রধানমন্ত্রী পদের যোগ্য দাবিদার বলে মনে করে। তাঁরা তাঁদের স্বপ্নকে দূরে সরিয়ে রেখে রাহুলকে প্রধানমন্ত্রী করতে ইউপিএ-তে সামিল হবেন, না রাহুল তৃতীয় ফ্রন্টের সহযোগী হয়ে লড়বেন— এটা কোটি টাকার প্রশ্ন। কংগ্রেসের পক্ষে সে ভূমিকা কি আদৌ পালন করা সম্ভব? কংগ্রেসকে বাইরে রেখে তৃতীয় ফ্রন্ট সরকার কি আদৌ গড়া সম্ভব হবে? এছাড়া রয়েছে বামেদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন। তৃণমূল ও বামেদের একই জোটে সামিল হওয়া প্রায় অসম্ভব। এতগুলি বিষয়কে এক জায়গায় এনে একটি অবিজেপি সরকার গঠন এখনও সোনার পাথর বাটির মতো অলীক।

এ সমস্ত বিষয় বিজেপির নজরে রয়েছে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তারা শুধু দাঁতে দাঁত চেপে এই কুনাট্য দেখে চলেছে। গান্ধী পরিবার এবং কংগ্রেস সরকারের অসংখ্য দুর্নীতির পর্দা ফাঁস হবার ভয়ে রাহুল এতটা ঘঙ্গাহস্ত হয়েছেন এমনটা ভাবাও অমূলক নয়। ইতিমধ্যেই বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা অসহিষ্ণুতার অভিযোগ যে সারবত্তাহীন ও উদ্দেশ্যমূলক (বিশেষত যে সময় মোদীজী ভারতকে জাতিপুঞ্জে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদ্যসপদ পাবার জোরালো দাবিদার করে তুলেছেন) সে কথা বলতে শুরু করেছেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি; আর কোনো বুদ্ধিজীবী পুরস্কার ফেরাচ্ছেন না। আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজনীতির সমীকরণেরও প্রচুর ভাঙা-গড়া হতে পারে। বিকল্প জোটের কলাকুশলীদের অনেক কেলেঙ্কারি (সারদার মতো) সামনে এসে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। এসব দুশ্চিন্তা থেকেই নীতিহীনদের এই উল্লাস মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে।■

অনিবার্য কারণবশতঃ এই সংখ্যার আকর্ষণ হিসেবে 'বিদেশে স্বদেশের নিন্দা কি সহিষ্ণুতা?' বিষয়টি প্রকাশ করা সম্ভব হলো না। এজন্য আমরা দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। —সঃ স্বঃ

সম্প্রদায় নিরপেক্ষ উন্নয়নের ডাক ফিরিয়ে দিল বিহার

সাধন কুমার পাল

দাদরির ঘটনার প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে পরস্পর লড়াই বন্ধ করে যৌথভাবে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামার আহ্বান জানিয়েছিলেন। গত লোকসভা নির্বাচনেও ধর্ম, সম্প্রদায় নিরপেক্ষ, গোষ্ঠী নিরপেক্ষ উন্নয়নের স্লোগানের পিঠে সওয়ার হয়ে বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রে এনডিএ সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছিল। বিহার বিধানসভা নির্বাচনেও একই স্টাইলে মাঠে নেমেছিল বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ ব্রিগেড। লোকসভা নির্বাচন ও সেই সঙ্গে মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের অভিঘাতে রাজনৈতিকভাবে অপাংক্তেয় হয়ে যাওয়া জাত-পাত ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিভেদ ভাবনাই যাদের মূলধন সেই রাজনীতির কারবারিরা বিহার বিধানসভা নির্বাচনে অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে পারস্পরিক শত্রুতা ভুলে ঐক্যবদ্ধ হতে সময় নেয়নি। ফলে শতকরা ভোটের হারে একক ভাবে দল হিসেবে সর্বোচ্চ অঙ্কে পৌঁছেও শোচনীয় হারের সম্মুখীন হতে হলো বিজেপিকে। ঠিক কোন রসায়নের জন্য আজ বিজেপির এই পরাজয় তা আজ ভাবাচ্ছে সবাইকে।

বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর টেলিভিশনের পর্দায় লালুপ্রসাদ যাদব ও রাহুল গান্ধীর শারীরিক ভাষা ও প্রতিক্রিয়ায় রাজনৈতিক বন্দি দশা কিংবা অপাংক্তেয় অবস্থা থেকে অপ্রত্যাশিত মুক্তির উচ্ছ্বাস প্রতিফলিত হচ্ছিল। হঠাৎ করে রুমাল থেকে বাঘ বনে যাওয়া এই দুই নেতার হালুম শুনে মনে হচ্ছিল নরেন্দ্র মোদী কিংবা বিজেপি নামক বস্তুটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো বলে। এবারের বিহার বিধানসভা নির্বাচন এমনই একটি নির্বাচন যে এখানে বিজয়ী পক্ষ অর্থাৎ নীতীশ-লালু-রাহুলের মহাজোটের জয়ের কারণ নিয়ে যত ময়না তদন্ত হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি কাটা ছেঁড়া হচ্ছে এনডিএ জোটের হারের কারণ নিয়ে। কারণ ভারতের রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া দুই ব্যক্তিত্ব নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহ প্রত্যক্ষ ভাবে নির্বাচনী ময়দানে অবতীর্ণ হয়েও শেষ রক্ষা করতে পারেননি। এই নিয়ে বহুবিধ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হচ্ছে। এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্যও ভোটের পাটিগণিত ও পরিসংখ্যানের সাহায্যে এনডিএ জোটের শোচনীয় পরাজয়ের কারণ খোঁজা।

সেই পাটিগণিত পেশের আগে হারের কারণ সম্পর্কে এনডিএ নেতৃত্বের বক্তব্যে চোখ রাখা যেতে পারে। এতে স্পষ্ট হবে পরাজিত এনডিএ জোটের লড়াই কতটা মোদী হাওয়া নির্ভর আর কতটা কঠিন বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। জিতেনরাম মাঝি এই বিপর্যয়ের দায় অর্গানাইজারে প্রকাশিত সংরক্ষণ বিষয়ক বক্তব্যের ঘাড়ে চাপিয়েছেন। মহাজোটের সামাজিক ভিত্তিকে দুর্বল করার লক্ষ্যে বিজেপির প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার জন্যই এই ফলাফল বলে মন্তব্য করেছেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। বেগুসরাইয়ের এমপি ভোলা যাদব আকারে ইঙ্গিতে খোদ নরেন্দ্র মোদীকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। শত্রুঘ্ন সিনহার বক্তব্যের সারমর্ম হলো তাঁকে গুরুত্ব দিলে বলা ভালো মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রজেক্ট করলে এরকম ফল হোত না। প্রতিক্রিয়ার তালিকা আর দীর্ঘায়িত না করে বলা যায় এনডিএ হারের কারণ বিশ্লেষণে পরিসংখ্যান খুব একটা গুরুত্ব পায়নি।

এই নির্বাচনে মোদী-অমিত শাহর বিজয়রথ আটকে দেওয়ার কৃতিত্বের দাবিদারও এখন অনেক। 'অসহিষ্ণুতা'র ইস্যুতে পুরস্কার/ সম্মান ত্যাগী লেখক, সাহিত্যিক, অভিনেতা, অভিনেত্রীদের গোষ্ঠীও রয়েছেন এই দাবিদারদের দলে। সাম্প্রতিককালে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া কয়েকটি দুর্ভাগ্যজনক বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে অসহিষ্ণুতা নামক শব্দবন্ধের মাধ্যমে জুড়ে দিয়ে ঠিক নির্বাচনের আগে এই গোষ্ঠী মিডিয়াভিত্তিক প্রতিবাদে নেমেছিলেন বলেই এই চমকপ্রদ ফল। রাজনৈতিক রঙ লাগার ভয়ে সরাসরি না হলেও নানাভাবে এমন দাবি প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন

> সংখ্যাতত্ত্ব থেকে এটা স্পষ্ট যে ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচন ও ২০১৫-র বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ ও মহাজোটের প্রাপ্ত ভোটের পার্থক্য একই থেকেছে। এই পার্থক্যের জন্যই মহাজোট এনডিএ-র তুলনায় ১২০টি আসন বেশি পেয়েছে।

অনেকেই। সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত এই গোষ্ঠী ২০০২ থেকে লাগাতার নরেন্দ্র মোদী ও সঙ্ঘ পরিবারের বিরুদ্ধে পুরস্কার ত্যাগ নামক প্রতিবাদটুকু ছাড়া আর সব ধরনের প্রতিবাদ করে এসেছেন। ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনের আগেও হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদী শক্তির বিরোধিতায় পুরো মাত্রায় সক্রিয় ছিল এই লেখক শিল্পী গোষ্ঠী। ২০১৪-র আগে এই গোষ্ঠীর মোদী বিরোধিতা জনমনে প্রভাব ফেলেছে এমন দাবি প্রতিবাদীরা নিজেরাও বোধহয় করবেন না।

সংখ্যাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বিহার নির্বাচনের ফলাফলে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই এবং এই ফলাফল সংক্রান্ত অন্য অনেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উপস্থাপিত যুক্তি, দাবি, পাল্টা দাবিগুলিকে বেশ দুর্বল বলেই মনে হবে। এই নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে উপস্থাপিত পরিসংখ্যান বলছে যেদিন নীতীশ-লালু- রাহুলের মহাজোট গঠিত হয়ে নীতীশ কুমারকে মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য ঘোষণা করা হয়েছে বাস্তবে সেদিনই বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। এক্ষেত্রে বিজেপি তথা এনডিএ জোটের করার মতো তেমন কিছুই ছিল বলে মনে হয় না। সদ্য প্রকাশিত বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে এনডিএ জোট ও নীতীশ-লালু-রাহুলের মহাজোটের প্রাপ্ত মোট ভোটের পার্থক্য ৩১ লক্ষের মতো। ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনেও এনডিএ জোট ও জেডিইউ+আরজেডি+কংগ্রেস প্রাপ্ত ভোট ছিল ৩১ লক্ষের কাছাকাছি। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এনডিএ পেয়েছিল ৩৮.৭ শতাংশ ভোট। আরজেডিইউ+আরজেডি+ কংগ্রেস পেয়েছিল ৪৪ শতাংশ ভোট। ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে বলা যায় ২০১৫-র বিধান সভায় সাফল্যের প্রতিযোগিতায় এনডিএ-র তুলনায় মহাজোট শুরুতেই অর্ধেক পথ এগিয়ে ছিল।

এ থেকে স্পষ্ট যে এবারের বিহার বিধানসভার নির্বাচনী পাটিগণিত কোনো ভাবেই এনডিএ-র পক্ষে ছিল না। এরকম প্রতিকূল সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে নির্বাচনী ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে এনডিএ-র সামনে দুটো পথ খোলা ছিল। এক, মোদী হাওয়াকে জাতপাতের সমীকরণ ও আঞ্চলিক সেন্টিমেন্টের উপযোগী করে কাজে লাগানো। দুই, মহাজোটের জোট রসায়নের নানা দুর্বলতা খুঁজে বের করে সেটাকে কাজে লাগানো। দুটো পথের কোনোটাকেই যে বিজেপি নেতারা সঠিক ভাবে কাজে লাগাতে পারেননি নির্বাচনের ফলাফলেই তা স্পষ্ট। বিহারের জনগোষ্ঠীর ১৬ শতাংশ যাদব গোষ্ঠীর মানুষ। লালু জমানায় রাজ্যের ভাগ্য নির্ধারক ও সবচেয়ে অধিক সুবিধাভোগীর ভূমিকায় থাকলেও বিগত এক দশক ধরে নীতীশ কুমারের শাসনকালে এই জনগোষ্ঠী ছিল কার্যত গুরুত্বহীন। অন্যদের কাছে লালু যাদব জামিনে মুক্ত সাজাপ্রাপ্ত হলেও যাদব গোষ্ঠীর কাছে এখনো মসীহা। আবার দীর্ঘ সময় ক্ষমতার বাইরে গুরুত্বহীন হয়ে থাকার ফলে উচ্চবর্ণদের মধ্যেও কোনো নির্দিষ্ট দলকে অবলম্বন করে রাজনৈতিক গুরুত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা জন্মেছিল। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও প্রচারশৈলীতে পরস্পর বিপরীত ধারার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষের অকাঙ্ক্ষা পূরণের কাজটি বিজেপি নেতৃত্বের পক্ষে কঠিন হলেও অসম্ভব ছিল না। প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই গোষ্ঠী সমীকরণ মাথায় রাখলেও সামগ্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় এই সমীকরণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ মুখ তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন বিজেপি নেতৃত্ব। বিহারের বিজয়ের পথ যে মহারাষ্ট্র, হরিয়ানার বিজয়ের পথ থেকে ভিন্ন প্রকৃতির তা বুঝতেও বিজেপি নেতৃত্ব অনেক দেরি করে ফেলেছিল।

পথ হিসেবে প্রথমটিকে গুরুত্ব না দিলেও এবং দ্বিতীয় পথটিকে বিজেপি নেতৃত্ব সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পথ হিসেবে বেছে নিয়েছিল। পরস্পর বিরোধিতায় ভরা মহাজোটের জোট রসায়ন ঠিক মতো কাজ না করলে ভোট ভাগাভাগির পাটিগণিতে লোকসভার মতো বিধান সভায়ও এনডিএ জয়ী হবে এরকম একটি হিসেব করেই ময়দানে নেমেছিলেন বিজেপি নেতৃত্ব। কিন্তু বাস্তবে মহাজোটের জোট রসায়ন নজিরবিহীন ভাবে এতটাই পাকাপোক্ত ভাবে কাজ করেছে যে এনডিএ জোটের যাবতীয় হিসেব উল্টে দিয়েছে। তাছাড়া নির্বাচনী পাটিগণিত অনুসারে এই অসম প্রতিযোগিতায় নেমেও এনডিএ নিজেদের ঘর ঠিকঠাক মতো গুছিয়ে উঠতে পারেনি। জিতনরাম মাঝি ও রামবিলাস পাশোয়ানের মধ্যে আসন সংখ্যা ও দলিত বর্গের প্রধান মুখ হয়ে উঠার পারস্পরিক লড়াই লেগেই ছিল। ফলস্বরূপ এই শরিক দলগুলি নিজেরা ডুবেছে সামগ্রিক ভাবে ডুবিয়েছে এনডিএ-কেও। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় ৩৮.৭ শতাংশ ভোটের প্রায় ৫ শতাংশ কমে ২০১৫ নির্বাচনে এনডিএ জোট পেয়েছে ৩৪.১ শতাংশ ভোট। মহাজোটের ভোট ৪৪ শতাংশ থেকে প্রায় ৩ শতাংশ কমে ৪১.৯ শতাংশ হলেও জোট রসায়নের দৌলতে অটুট থেকেছে! জোট হিসেবে জয়ের ধারা অটুট রয়ে গেছে। সংখ্যাতত্ত্ব থেকে এটা স্পষ্ট যে ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচন ও ২০১৫-র বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ ও মহাজোটের প্রাপ্ত ভোটের পার্থক্য একই থেকেছে। এই পার্থক্যের জন্যই মহাজোট এনডিএ-র তুলনায় ১২০টি আসন বেশি পেয়েছে। আরেকটি হিসেব বলছে, ১৫৯টি আসনে লড়ে বিজেপি প্রার্থীরা মহাজোটের প্রার্থীদের তুলনায় গড়ে ১৩৫০টি ভোট কম পেয়েছে। পাশাপাশি এনডিএ জোটের অন্যান্য শরিকরা বাকি আসনগুলিতে লড়ে মহাজোটের প্রার্থীদের তুলনায় গড়ে ৮৫০০ (১৬ শতাংশ) ভোট কম পেয়েছে। এই পরিসংখ্যানও বলছে বিজেপিকে ডোবানোর পেছনে শরিকদের অবদানও কম নয়। উচ্চবর্ণের নির্দল প্রার্থী ও গোঁজ প্রার্থীরাও বিজেপির ভোট শতাংশেই থাবা বসিয়েছে এমনটাই মনে করছেন অনেকে। কারণ দীর্ঘ সময় ধরে বিহারে ক্ষমতার বাইরে থাকা উচ্চবর্ণের মানুষেরা দলিত বর্গ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বানানোর বিজেপির ঘোষণাকে ভালো ভাবে নেয়নি।

পঞ্চম দফায় অনুষ্ঠিত বিহারের সীমাঞ্চলের ভোটের পাটিগণিতে চোখ রাখলে আরো স্পষ্ট হবে যে সংরক্ষণ, অসহিষ্ণুতা, দাদরি, গোহত্যার মতো ইস্যু এবং বিভিন্ন স্তরের বিজেপি নেতাদের বিভিন্ন মন্তব্যকে পরাজয়ের কারণ হিসেবে তুলে ধরে যে সমস্ত বিশ্লেষণ করা হচ্ছে তার কোনো প্রামাণিকতা নেই। ২০১৪-র লোকসভার প্রাপ্ত ভোটের হিসেব অনুসারে বহু কথিত মোদী হাওয়ায় এই মুসলমান- যাদব নির্ণায়ক শক্তিযুক্ত এই অঞ্চলে বিজেপি ১৭টি বিধানসভা আসনে এগিয়ে থাকলেও জেডিইউ+আরজেডি+ কংগ্রেস এগিয়ে ছিল তিন ডজনেরও বেশি আসনে। ২০১৫-র বিধান সভা নির্বাচনেও এই অঞ্চলে বিজেপি পেয়েছে ১৮টি এবং মহাজোট পেয়েছে ৩৯টি আসন। অর্থাৎ জোট দেবতা নির্বাচনী নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই যেন ফলাফল নির্ধারিত করেই রেখেছিল। রথযাত্রা দেখে কবির যেমন মনে হচ্ছিল 'রথ ভাবে আমি দেব পথ ভাবে আমি, মূর্তি ভাবে আমি দেব হাসে অন্তর্যামী।' তেমনি বিহারে এনডিএ-জোটের বিজয়রথ আটকে দেওয়ার অনেক দাবিদার দেখে জোট দেবতাও হয়তো অন্তরালে থেকে হেসেছেন। ▮

চিঠিপত্র

অসহিষ্ণুতা

'অসহিষ্ণুতা'— এই শব্দটি বর্তমানে সারা ভারতবর্ষের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়।

গত এক বছরে নাকি ভারতবর্ষে এই অসহিষ্ণুতা সবথেকে প্রকট হয়েছে। ইতিহাস কি তাই বলে?

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কাশ্মীর, জুনাগড় এবং হায়দরাবাদ সেনা অভিযানের দ্বারা ভারতভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু নেহেরুজী শুধুমাত্র কাশ্মীরের জন্য আলাদা সংবিধান, আলাদা পতাকা এবং আলাদা প্রধানমন্ত্রীর পদ সৃষ্টি করেন। তাঁর এই অন্যায় এবং সংবিধান বিরোধী কাজের বিরোধিতা করে ১৯৫৩-তে যখন ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী কাশ্মীরে প্রবেশ করেন তখন নেহরুর নির্দেশে শেখ আব্দুল্লার পুলিশ তাঁকে বন্দী করে এবং আমৃত্যু তাঁকে কারাগারে রেখে অত্যাচার করা হয়। এটা কি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রতি নেহরুর 'অসহিষ্ণুতা' নয়?

১৯৬২ খৃষ্টাব্দে দেশের সৈন্যবাহিনী যখন চীনের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, তখন চীনা কমিউনিস্টদের জাতভাই ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি বাংলার রাস্তায় রাস্তায় স্লোগান দিয়ে মিছিল করছে— 'চীনের চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান/মাও যুগ যুগ জীয়ো।' ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতি এটা কি বামপন্থীদের চরম 'অসহিষ্ণুতার' নিদর্শন নয়?

১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রথমে এলাহাবাদ হাইকোর্ট এবং তারপর সুপ্রিম কোর্ট যখন ইন্দিরা গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ করে দিল তখন গণতন্ত্রের টুঁটি চেপে ধরে তিনি সারাদেশে জরুরি অবস্থা জারি করলেন। ইন্দিরার অন্যায়ের বিরুদ্ধে যখন দেশের সর্বোচ্চ আদালত রায় দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল তখন যেভাবে তিনি বিচার ব্যবস্থা এবং সংবিধানের বিরুদ্ধাচরণ করলেন সেটা কি তাঁর চরম 'অসহিষ্ণুতার' নিদর্শন নয়?

বামপন্থীদের কাছে ধর্ম হলো 'আফিমের' সমান। তাই যাঁরা ধর্ম পালন করে তাঁদেরকে ওরা সহ্য করতে পারে না। যার পরিণতি আমরা দেখতে পাই যখন বিজন সেতুর উপর ১৮ জন আনন্দমার্গী সন্ন্যাসীকে নৃসংশভাবে খুন করা হয়। বামপন্থী বুদ্ধিজীবী--- 'মন্দাক্রান্তা দেবী' এটাকে কি অসহিষ্ণুতা বলে না?

১৯৮৫ খৃষ্টাব্দে মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন তাঁর সুপুত্র রাজীব গান্ধী। স্বামী পরিত্যক্তা বৃদ্ধা শাহবানু বেগমের পক্ষে সর্বোচ্চ আদালত যে রায় দিয়েছিল তার বিরুদ্ধাচরণ করে নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতা বলে নতুন আইন প্রবর্তন করলেন। ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার প্রতি কি এটা তাঁর এক ধরনের 'অসহিষ্ণুতা' নয়?

১৯৮৪ খৃষ্টাব্দে দু'জন শিখের হাতে ইন্দিরা গান্ধী নিহত হয়েছিলেন সে জন্য ৪০০০ শিখকে খুন করা হয়েছিল এবং রাজীব গান্ধী স্বয়ং তাকে সমর্থনও করেন। এটা কি একটা সম্প্রদায়ের প্রতি চরম 'অসহিষ্ণুতার' প্রকাশ ছিল না?

একটা দেশের হৃদপিণ্ড হলো সেই দেশের জাতীয় সঙ্গীত এবং জাতীয় পতাকা। জামিয়াত-উলেমা-ই-হিন্দ্ বা দার-উল-উলুমের মতো সংগঠনগুলি যখন ইসলামের পরিপন্থী এই অজুহাতে সেই জাতীয় সঙ্গীতকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারে বা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যখন জাতীয় পতাকার অবমাননা হয় তখন সেটাকে কি অসহিষ্ণুতা বলে না?

কাশ্মীরের পণ্ডিতরা নিজদেশে যেভাবে উদ্বাস্তুর জীবন কাটাচ্ছে তাতে যদি তারা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে তবে কি তাদের এই 'অসহিষ্ণুতাকে' অন্যায্য বলা হবে?

ডা. মুখার্জী বলতেন, "One Nation, One Nishan, One Bidhan, One Prodhan." ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে স্বাধীনতার ৬৮ বছর পরও স্বাধীন ভারতবর্ষে 'অভিন্ন দেওয়ানী বিধি' আজও চালু হলো না। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে আর কতদিন 'সহিষ্ণুতার' পরীক্ষা দিতে হবে?

'গোমাংস ভক্ষণ' মুসলমান রীতি অনুযায়ী বাধ্যতামূলক নয়, তবুও দীর্ঘদিন ধরে সেই প্রথা চালু রাখা হয়েছে শুধুমাত্র বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্ম বিশ্বাসকে আঘাত দেওয়ার জন্য নয় কি? কারণ, হিন্দুরা 'গাভীকে' 'মাতা' বলে সম্বোধন করে এবং 'গোরু' তাদের কাছে ধর্মীয় রীতি অনুসারে অত্যন্ত পবিত্র প্রাণী। সেই গো হত্যা বন্ধ না হওয়ার জন্য হিন্দুদের কে আর কতদিন সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে হবে?

—পিনাকী দে,
রাজা মণীন্দ্র রোড, পাইকপাড়া,
কলকাতা-৩৭।

॥ ২ ॥

দিন কয়েক আগেও দৈনিক সংবাদপত্র আর টেলিভিশনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে যেন মনে হচ্ছিল গোটা দেশে শুধু 'অসহিষ্ণুতা' ছাড়া অন্য কিছু নেই। কমবেশি প্রত্যেকটি মিডিয়াতেই মূলত প্রত্যক্ষভাবে বা কিছু ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে কেন্দ্রীয় শাসকদল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও আরও কিছু সংগঠনের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ ছাড়াই বহু অভিযোগে জর্জরিত করা হচ্ছিল। সাধারণ দেশবাসী অসহিষ্ণুতার শিকার হচ্ছেন, ২৪ ঘণ্টাই যেন 'অসহিষ্ণুতা' চলছে, যেন প্রত্যেকের মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয়েছে— এমনই বাতাবরণ তৈরির চেষ্টা শুরু হয়েছিল সংবাদমাধ্যম আর কিছু অখ্যাত শিল্পীদের পদক ফেরানোর মাধ্যমে। এই ইচ্ছাকৃত সৃষ্ট শব্দচয়নের দ্বারা কারা মানবমনকে প্রভাবিত বা বিকৃত করতে চেয়েছেন তা এখনও অধরা। কিন্তু যারাই করুক না কেন, তারা যে বিহারের ভোটের রাজনীতিকে প্রভাবিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর কারণ টানা কয়েক দিন ধরে চলতে থাকা 'অসহিষ্ণুতা' ও নানা বিতর্ক আজ একনিমেষে উধাও হয়ে গেছে সব জায়গা থেকে এবং তা বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন থেকেই।

যারা এসব প্রতিবাদ করছেন তাদের

নির্দিষ্ট শিল্পকর্মের ক্ষেত্র সম্পর্কে দেশের অধিকাংশ মানুষই অবগত নন, তারাও ততটা পরিচিত নন, হয়তো এমনও হতে পারে পদক প্রত্যাহারের মাধ্যমে তারা একইসঙ্গে নিজেদের কিছুটা প্রচার ও রাজনৈতিক কিছু দলের উদ্দেশ্য পূরণ করতে তাদেরই সৃষ্ট 'অসহিষ্ণুতার' সহায়ে মাঠে নেমেছিলেন। বিশিষ্ট অভিনেতা শাহরুখ খানকে 'পাকিস্তানের এজেন্ট' বলা হয়তো কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণ বা নথি ছাড়া একেবারেই সঙ্গত নয়। কিন্তু পাশাপাশি এটাও ঠিক ওই শাহরুখ খানই লন্ডনে বসে গতবারে পাকিস্তানের বন্যাপীড়িতদের (flood victions) জন্য অর্থ সংগ্রহ (Fund Raise) করেছিলেন। যে সক্রিয়তা ভারতের উত্তরাখণ্ড বা নেপালের দুর্গতদের জন্য একেবারেও আমাদের চোখে পড়েনি। এতে তাঁকে 'এজেন্ট' না বলা গেলেও তাঁর অতি সহানুভূতি পাকিস্তানের জন্য যে দেখা গেছে তা সন্দেহাতীত। যাইহোক, এখন আর 'অসহিষ্ণুতা' নেই, হয়তো আদৌ ছিল না, না থাকাটাই শ্রেয়। শুধু তাই নয়, এই এতো ক্ষণিকের জন্য স্বেচ্ছায় সৃষ্ট 'অসহিষ্ণুতা'ও না হওয়া কাম্য।

—**অত্রি মল্লিক,**
বর্ধমান।

।। ৩ ।।

ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' সিনেমাটা হয়তো দেখেছেন। সকলে ঋত্বিক ঘটককে ধন্য ধন্য করেন এইরকম একটা সিনেমা নির্মাণ করেছেন বলে। কিন্তু ওই সংসারটার ওইরকম পরিস্থিতি হলো কেন? কোনো বুদ্ধিজীবী চিন্তা করেছেন কি? হ্যাঁ আমি তাঁদের কথা বলছি যাঁরা এখন সহিষ্ণুতা নিয়ে বড় বড় কথা বলছেন। ভারতবর্ষ নাকি যুগ যুগ ধরে সহিষ্ণুতার ধারক ও বাহক। কোটি কোটি হিন্দু নরনারী অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, ধর্ষিতা হলো কেন? যেন ঘটনাটা ইতিহাসে ঘটেইনি? বাংলা বা পাঞ্জাব কেন, সেই সুলতান মামুদ থেকে আজকের ক্যানিংয়ের নোদাখালি কোনো সহিষ্ণুতার বার্তা বহন করে? সুলতান মামুদ, মহম্মদ ঘোরি, নাদির শাহ, তৈমুরলং, এদেশে এসে লুটপাট, অত্যাচার, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, ক্রীতদাস-দাসী করে নিয়ে যাওয়া কিনা করে গেছেন। এই সব ব্যক্তিরা কোনো সহিষ্ণুতার প্রতীক? এত অত্যাচার সত্ত্বেও আমরা এই সব ব্যক্তিদের বা তাদের বংশধরদের আপন করে নিয়েছি। এই সহিষ্ণুতার কোনো মূল্য নেই। ভারতবর্ষের দুর্বলতা তাঁরা এসবের বিরুদ্ধে কয়েকজন ছাড়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেনি। এই সহিষ্ণুতার ফলে আমরা আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ হারিয়েছি। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে, এই সহিষ্ণুতার ফলে। কে বলতে পারে আজকের এই সহিষ্ণুতার ফলে ভারতবর্ষ আবার খণ্ডিত বা হিন্দু বর্জিত হবে না। দুর্গত বুদ্ধিজীবী যাঁদের ভারতবর্ষের সঙ্গে কোনো যোগ নেই তাঁরা মোদীজীকে হিন্দু তালিবান বলে বিক্ষোভ দেখায়। এই মোদীজীকে ১২৫ কোটির ভারতবর্ষ নির্বাচিত করেছে, ওই সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের ভোটে নয়। কলকাতার প্রাক্তন মেয়র বিকাশ ভট্টাচার্য ধর্মনিরপেক্ষতা দেখাতে গিয়ে ধর্মতলায় কবি সুবোধ সরকারকে নিয়ে গোমাংস ভক্ষণ করেন। পারবেন কোনো মুসলমানকে নিয়ে শূকরের মাংস খেতে? তাই বলছিলাম, ভারতবর্ষের রক্তে সহিষ্ণুতা বর্তমান। এই নিয়ে দেশে, বিদেশে হৈহৈ করা বা পদক ফেরানোর কোনো যুক্তি নেই। এই তো প্যারিসে এত বড় একটা রক্তাক্ত কাণ্ড ঘটে গেল। এখন শাহরুখ খান চুপচাপ কেন? কোনো মুসলমান নেতা বা বুদ্ধিজীবী প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করছেন না কেন?

—**কমল মুখার্জী,**
চুঁচড়া, হুগলী।

সবার প্রিয় ®
বিল্লদা
চানাচুর

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

Swachchha Bharat   Swabolombee Bharat
How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

+ Low Cost readymade Latrine (Toilet) + Low Cost House
+ Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
+ Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact
ABC ENGINEERS & SERVICES
"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71,
Park Street, Kolkata - 700 016
M : 98311 85740, 98312 72657,
Visit Our Website : www.calcuttawaterproofing.com

মহারাষ্ট্রের তীর্থে তীর্থে

নিমাই কুমার মুখোপাধ্যায়

মহারাষ্ট্র সত্যই এক মহান রাজ্য। এ রাজ্য সব দিক দিয়েই সুন্দর। যেমন পাহাড়, তেমনই সমুদ্র। সেরকম ব্যবসা বাণিজ্য, চাষবাস, তীর্থক্ষেত্র। কি নেই এখানে? শিবাজী মহারাজ থেকে ডাঃ হেডগেওয়ার, শ্রীগুরুজী, লোকমান্য তিলক প্রমুখ অসংখ্য মহাপুরুষদের জন্মস্থান এই মহারাষ্ট্র। নাগপুর থেকে রত্নগিরি—বিশাল এলাকায় স্বর্গীয় সুষমা বিরাজ করছে। যেমন মারাঠীদের দেশপ্রীতি, সেরকমই অটুট ভক্তি ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের প্রতি। শিবাজী মহারাজের স্বাভিমান, দেশভক্তি, স্বাধীনতাপ্রিয়তা মারাঠীদের শিরায় শিরায় বইছে। দুর্গম পাহাড়, রুক্ষ প্রকৃতিকে তারা তাদের অসীম বীরত্ব ও পৌরুষের দ্বারা জয় করেছে। আজ ভারতবর্ষে কোন্ রাজ্য বেশি এগিয়ে যাবে— গুজরাট না মহারাষ্ট্র— এ নিয়ে এই দুই রাজ্যের মধ্যে সুষম, সার্থক প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে।

মহারাষ্ট্রের পথে প্রান্তরে ঘুরে এরকম ধারণাই মনের মধ্যে দৃঢ় হয়েছে। এ রাজ্যের ৪/৫টি এলাকা ভালভাবে ঘুরে দেখার সুযোগ হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে শৈবতীর্থ ভীমাশঙ্কর, মহাবালেশ্বর, রত্নগিরি, গণপতিপুলে, লোনাভালা এবং পুনে। ভীমাশঙ্কর আদি শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একটি। মহারাষ্ট্রেই রয়েছে এরকম আরো দুটি জ্যোতির্লিঙ্গ— ঘৃষ্ণেশ্বর ও ত্র্যম্বকেশ্বর। এছাড়া পারলি বৈজনাথকেও অনেকে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম একটি বলে গণ্য করেন। ওই কৃতিত্বের সম দাবিদার আমাদের পাশের রাজ্য ঝাড়খণ্ডের বৈদ্যনাথধাম।

ভীমাশঙ্কর পুনে থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার। পাহাড়ি পথ, পুনে থেকে প্রতি ঘণ্টায় বাস যায়। পুনেতে তো বটেই, সমগ্র মহারাষ্ট্রেই সরকারি বাসের চল। বেসরকারি বাস প্রায় নেই বললেই হয়। তাছাড়া সরকারি বাসের ব্যবস্থা এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও নিয়মিত যে অন্য বাসের কথা ভাবার প্রয়োজনই হয় না।

বেশ কয়েকধাপ সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এসে ভীমাশঙ্করজীর দর্শন পেলাম। পুরোহিতদের ব্যবহার ভারী সুন্দর। তাঁরা যেন পুরবাসীর হিত করার জন্য বাবা মহাদেবের সেবায় নিয়োজিত। ভারতবর্ষের বেশ কিছু জায়গায় পুরোহিত এবং পাণ্ডাদের অত্যাচার ও অর্থলোলুপতা যেভাবে চোখে পড়ে, এখানে তার বিপরীত। তীর্থযাত্রীকে ফল, নারকেল, বেলপাতা, আতপচাল প্রভৃতি দিয়ে তাঁরা পূজায় সহায়তা করছেন। বিনিময়ে কিছু চাইছেন না। এ এক অভাবনীয় অভিজ্ঞতা। এ থেকেও মারাঠা চরিত্রের নির্লোভতা ও সাধুতার উদাহরণ মেলে।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থান মহাবালেশ্বর। একে মহারাষ্ট্রের দার্জিলিং বলা হয়। বৈশাখের প্রথম সপ্তাহ হলেও কী আরাম! গরমের ছিটেফোঁটাও উপলব্ধি

হলো না। তেমনই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা মহাবালেশ্বর। স্ট্রবেরি ও মলবেরি বাগান প্রচুর। উঁচু পাহাড় থেকে নিম্নে প্রবাহিত কৃষ্ণানদীর দৃশ্য অপরূপ। ইকো পয়েন্ট, সান্‌সেট্‌ পয়েন্ট, মহাবালেশ্বর, অতিবালেশ্বর শিব মন্দির, পঞ্চগঙ্গা মন্দির প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান অনেক। পথে দেখা গেল তিন বুনো বাইসনের। এখানে মেঘ ও রৌদ্রের মাঝে জলভরা মেঘ হঠাৎ মাটিতে নেমে আসছে। আমরা ভাবছি খুব বৃষ্টি হবে। ওমা, কোথায় বা কী? যেসব যাত্রী নিজস্ব যানে বেড়াচ্ছেন, তাদের অনেকেই ওই জলাভ মেঘের সঙ্গে খেলা করছে, নৃত্য করছে— তা সে যুবক, যুবতী, শিশু যেই হোক না কেন। এই যে আমোদপ্রিয়তা, সাবলীল সুকুমার বৃত্তির প্রয়োগ, যে নাচে অশ্লীলতার বিন্দুমাত্র নেই, তা যেন মারাঠাবাসীকে আমাদের চোখে কত মহান করে তুলল, তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

মহাবালেশ্বরে আমরা দু'রাত্রি ছিলাম। প্রথমদিন মহাবালেশ্বর দর্শন করলাম, সরকারিবাসে যা ভ্রমণার্থীদের সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হয় মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার জন্য। কম করচে অথচ নিরাপদে দ্রষ্টব্যস্থানসমূহ দেখা যায় গাইডের সাহায্য ছাড়াও।

দ্বিতীয়দিন ওই রকমই এক সরকারি বাসে প্রতাপগড় গেলাম। মহাবালেশ্বর থেকে এর দূরত্ব প্রায় ২৫ কিলোমিটার। পাহাড়ি পথ, তবে নিম্নগামী থাকায় বাস একটু দ্রুত এল। এই সেই প্রতাপগড় যা শিবাজী মহারাজের দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল। এইখানেই তিনি মাওয়ালী সেনা যোগাড় করে মোগলদের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। এই প্রতাপগড় থেকেই লোহার শিরস্ত্রাণ, বর্ম ও বাঘনখ পরিহিত হয়ে মোগল সুবেদার আফজল খাঁর সুচতুর ছলনা ব্যর্থ করে আফজল খাঁকে হত্যা করেন। মোগলের বিরুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য দুর্গের নাম প্রতাপগড় রাখা হয়। প্রতাপ অর্থে শৌর্য বা বিজয়। এখানে শিবাজী মহারাজের আরাধ্যা দেবী ভবানীমাতার মন্দির রয়েছে এবং শিবাজী মহারাজ ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক, এমনকী সেই শিরস্ত্রাণ, বর্ম, বাঘনখ প্রভৃতি এক সংগ্রহশালায় রাখা আছে। দুর্গটি বেশ সুরক্ষিত।

পরদিন সকালে আমরা রত্নগিরির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। মহাবালেশ্বর থেকে মাঝামাঝি শহর কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অতুলনীয়। পশ্চিমদিক আরব সাগরে ঘেরা, বাকি দু'দিক ছোটখাট টিলা, মাঝারি পাহাড়, কোথাও বা সামুদ্রিক খাড়ি। মধ্যে রত্নগিরির নয়নাভিরাম দৃশ্য। বিকেলের পড়ন্ত রোদে রত্নগিরির সমুদ্রোপকূলে বসা এবং প্রাক্‌ সান্ধ্যসূর্যের রক্তিমচ্ছটা এবং সূর্যের সঙ্গে সমুদ্রের লুকোচুরি খেলা সত্যিই অপূর্ব। এখান থেকে আরব সাগর দেখার বৈশিষ্ট্য হলো জেটি সমুদ্রের ভেতর প্রায় আধ কিলোমিটার চলে গেছে এবং জেটির একপাশে হেলান দেওয়া সিমেন্টের বেঞ্চ আছে যেখান থেকে আগন্তুকরা বসে সমুদ্রের শোভা দর্শন করতে পারেন। পিছনে মুখর নগরী রত্নগিরি। সামনে সমুদ্রের কলকল্লোলিত উর্মিমালা— না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না যে মানুষ আর প্রকৃতির এরূপ অপূর্ব সহাবস্থান। স্থান ত্যাগ করতে ইচ্ছে করছিল না— যেন সমুদ্রের সঙ্গে প্রণয়ের পূর্বরাগ চলছে।

কিন্তু ক্ষুধারাক্ষসী আমাদের প্রণয়ের পূর্বরাগের বিচ্ছেদ ঘটালো। রত্নগিরির খাবার অন্যান্য স্থানের তুলনায় সস্তা। এখানেও মারাঠী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলাম। তাজা খাবার, সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর। বহিরাগত বলে ঠকানোর কোনো প্রয়াস নেই। যুবক ব্যবসায়ী মালিক ফলের রস, জ্যামজেলি নিজেই বানিয়ে বিক্রি করছে। এজন্য সে খুবই গর্বিত ও আনন্দিত। রাত্রি ৯টার মধ্যে শহরের দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যায়। আমরা আমাদের লজে ফিরলাম খাওয়া দাওয়া সেরে। মহারাষ্ট্রের যে সব জায়গায় আমরা ঘুরেছি (পুনে, মহাবালেশ্বর, রত্নগিরি) সর্বত্রই ৮০০—১০০০ টাকার মধ্যে ডাবল বেডের ভাল ঘর পাওয়া যায়। বেশ বড় ঘর— সর্বাধুনিক ব্যবস্থাযুক্ত। অত উঁচু পাহাড়ি শহরে কোথাও কোনো জলের কষ্ট নেই।

পরদিন ভোরে উঠে গণপতিপুলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। রত্নগিরি থেকে এর দূরত্ব ২০ কিলোমিটার। সরকারি বাসে গেলাম; সময় লাগল প্রায় ২ ঘণ্টা। পাহাড়ি পথ। পাশাপাশি গ্রামগুলোকে ছুঁয়ে আছে, তাই সময় একটু বেশি লাগল। নৈসর্গিক দৃশ্য ভারী চমৎকার। গণপতি মারাঠিদের প্রিয় দেবতা।

মহারাষ্ট্রের বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধির পিছনে বাবা গণেশের একটা অদৃশ্য হাত আছে বলে তারা বিশ্বাস করে। তা ছাড়া ভারতের পশ্চিমদ্বারের দেবতা গণেশ সেখানে বিরাজমান। আরব সাগরের তীরে অবস্থিত ছোট্ট একটি শহর গণপতিপুলে। এখানের বেলাভূমি ভারতের সব সমুদ্রোপকূলের চাইতে সুন্দর। অত উত্তাল সিন্ধু সাগর এখানে শান্ত সমাহিত। যেন বাবা গণপতির উদ্দেশে শান্তলয়ে প্রণতি জানাচ্ছে। পুরীর বা মহাবলীপুরমের যে বেলাভূমি বিখ্যাত, এখানে যেন সেগুলিকেও ছাড়িয়ে যায়। এখানে ডাইনে বাঁয়ে প্রায় ২ কিলোমিটার বেলাভূমি লক্ষ্য করলাম, যা সাদা বালুকারাশিতে ভরা— যেন রূপার ঝক্‌ঝকে পাত রোদে শোওয়ানো আছে। স্পিডবোট, ছোট নৌকোয় করে যাত্রীদের সমুদ্রে চক্কর কাটিয়ে দিচ্ছে সামান্য অর্থের বিনিময়ে। আর সমুদ্রে স্নানার্থী তো অগুনতি, কারণ এখানে ঢেউয়ের তীব্রতা নেই। পুলিশি পাহারার বন্দোবস্ত রয়েছে।

বেলা ১০টার মধ্যে আমরা গণপতিপুলে থেকে ফিরে এলাম এবং একটা অটো ভাড়া করে রত্নগিরির বিখ্যাত কয়েকটি স্থান দেখে নিলাম। ভগবতী মন্দির ও রত্নগড় দুর্গ শহর থেকে প্রায় ৪/৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। পুরনো রাজবাড়ির সামান্য কিছু চিহ্ন এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। দুর্গ থেকে শহর বেশ ভালো দেখা যায়। পরের দ্রষ্টব্য স্থান সাদা বালির সমুদ্র উপকূল এবং মৎস্যজীবীদের আবাস। সেখানে মাছ ধরার জাল রোদে শুকাচ্ছে। সারি সারি নৌকো সমুদ্র কিনারায় বাঁধা। এখান থেকে দেশে এবং বিদেশে মাছ চালান দেওয়া হয়। নিকটেই অবস্থিত বিখ্যাত ফিস অ্যাকোরিয়াম যেখানে রয়েছে নানা জাতের মাছ, রঙিন মাছ, কুমির ছানা ইত্যাদি। এটিও দেখার মতো।

পরের দ্রষ্টব্য স্থান লোকমান্য তিলকজীর

বাড়ি, যা সরকার অধিগ্রহণ ও সংরক্ষণ করেছে এবং একটি সংগ্রহশালা স্থাপন করেছে। এখানে এসে প্রাক্-স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবন, তাঁদের আত্মত্যাগ গভীরভাবে স্মরণে এলো। বর্তমানের দেশনেতাদের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে প্রাণে ব্যথা লাগল। এ আমরা কোথায় চলেছি! বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে— আমরা তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছি তো?

সময়াভাবে আরো কয়েটি দ্রষ্টব্য স্থান দেখা হলো না। ভোরে উঠার ক্লান্তি তো ছিলই। পরদিন ভোরে এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা। এসব ভেবে হোটেলে ফিরে এলাম খাওয়া সেরে বিশ্রাম নেবার জন্য। বিকেলে যথারীতি Black Sea Beach-এ বসে সূর্যাস্ত দেখলাম এবং স্থান বৈশিষ্ট্যতার সৌন্দর্যে ডুব দিলাম। পরদিন ভোরে রত্নগিরি ছেড়ে এলাম, কিন্তু মনের মণিকোঠায় তাকে কোনোদিনই ছাড়া যাবে না। রত্নগিরি রত্নের মতই ঔজ্জ্বল্যে চির অম্লান থাকবে।

পরের গন্তব্যস্থান লোনাভালা। পুনে থেকে ৬৪ কিলোমিটার দূরের এক পরিচ্ছন্ন পাহাড়ি শহর। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর থাকায় পুনে এবং মুম্বইয়ের ধনী, অভিজাতরা এখানে একটি করে প্রাসাদ বানিয়ে রেখেছেন তাদের ভোগবিলাস চরিতার্থ করার জন্য।

এবার লোনাভালার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ডুব দিই যা দেশ বিদেশের ভ্রমণার্থীদের কাছে খুবই উপভোগ্য। লোনাভালার চারদিকেই পাহাড়ে ঘেরা। নীচে ন্যাশনাল হাইওয়ে। একদিকে প্রকৃতি তার রূপ উন্মোচনের জন্য উন্মুখ, নীচে ব্যস্ত নানা রংয়ের গাড়ির সারি যারা মুম্বই বা পুনের দিকে ধাবমান। প্রকৃতি মন ভরাতে পারে, পেট ভরাতে পারে না। Tea is better than poetry। তাই পেটের ধান্দায় বাণিজ্য নগরীগুলিতে ছাউনি ফেলতে সবাই ব্যস্ত। লোনাভালার শুটিং পয়েন্ট থেকে এ দৃশ্য ভারী চমৎকার। বলিউডের বহু বিখ্যাত সিনেমার শুটিং এখানে হয়েছে ও হচ্ছে। ক্লান্ত শহরের ঘুম ভাঙার আগেই আমরা পৌঁছে গেছি তার রূপদর্শনে। যে রূপ সদাবিরাজিত তাকে দেখার জন্য সময়ের অপেক্ষা করতে হয় না। প্রয়োজন, দ্রষ্টার কতটা ক্ষুধা আছে, তার উপর।

লোনাভালার সন্নিকট খাণ্ডালায় আমরা পৌঁছলাম সকাল ৭টায়। এখানের বিখ্যাত মন্দিরে ব্যাঘ্রাসীনা দেবী যাঁকে আমরা এখানে (বঙ্গদেশে) জগদ্ধাত্রী বলে পূজা করি, তাঁকে লোনাভালায় বাঘা-ডাই বলে মান্য করে। আমরা যখন মন্দিরে গেলাম তখন দেবীর অঙ্গরাগ চলছে। মন ভরে দেবীকে দর্শন করে বেরিয়ে আসছি, দেখা হলো এক মানতকারী দলের সঙ্গে যাঁরা গাড়িতে করে দেবীর সন্তোষের জন্য নানাবিধ আয়োজন এনেছেন। আমাদের বিদেশি জেনে প্রাতকালীন চায়ে আপ্যায়ন করলেন। এইসব মানুষজন এবং তাঁদের বাড়ির মেয়েদের আন্তরিকতায় এবং অতিথি বৎসলতায় আমরা মুগ্ধ হলাম।

একটু পরেই পাশের বাগানে গেলাম যেখানে সিনেমার শুটিং হয় এবং যেখানে থেকে লোনাভালের চতুর্দিক সুন্দর দেখা যায়—যেন মনে হয় চারিপাশে পাহাড়ের কোলে ছোট্ট এই শহর। এখানের সঙ্গে উত্তরাখণ্ডের মায়াবতীর দৃশ্য তুলনীয়। এগুলো দেখে এবং ধনীদের প্রাসাদগুলোক সেলাম জানিয়ে আমরা ফিরে এলাম লোনাভালার মাঝে এক লেকে। সেখানে মাছের ঝাঁক পথিকদের দেওয়া খাবার বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে। ওইসব ক্রীড়া কৌতুক দেখে আমরা রওনা দিলাম কারলার উদ্দেশে— লোনাভালা থেকে ১১ কিলোমিটার দক্ষিণে। লোনাভালা থেকে এনএইচ-৪ ধরে ৯ কিলোমিটার গিয়ে এক চৌরাস্তা। সেখান থেকে ২ কিলোমিটার বামদিকে গেলে কারলা গুহা। এটি বৌদ্ধ আমলের এক প্রশস্ত গুহা। ৩৬৫ সিঁড়ি বেয়ে গুহার সামনে পৌঁছলাম। খৃষ্টজন্মেরও প্রায় ১৫০ বছর আগে এই গুহা তৈরি। মূলত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বাসস্থান ছিল এটি। ভারতে বৌদ্ধ চৈত্যগুলির এটি বৃহত্তম। হীনযান বৌদ্ধ গুহা এটি। ১৬ মিটার উঁচু, ৪৫×৪৫ মিটার চৈত্য হলটি সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত। গুহার তোরণ দ্বারে রয়েছেন শ্রী একবিরা দেবী। আমাদের মনে হলো শ্রীশ্রী চণ্ডীতে দেবী নিজের সম্বন্ধে যা বলেছেন, 'একৈবাহং জগত্যত্র, দ্বিতীয়া কা মমাপরা'— অর্থাৎ, এই জগতে আমিই একমাত্র শক্তি; আমার দ্বিতীয়া কেউ নেই। একবিরা নামের মধ্যেও সেই সার্থকতা আছে বলে মনে দৃঢ় প্রত্যয় হলো। তুষারলিঙ্গ দর্শন করতে অমরনাথ যাত্রায় যেমন অনেক সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়— সেরকম অনেক সিঁড়ি বেয়ে পাহাড়ের গুহামুখে শ্রী একবিরা মাতার দর্শন হলো। দর্শনের ব্যবস্থাও বেশ যুগোপযোগী। ভক্তদের সারিবদ্ধভাবে যাবার জন্য স্টিলের রেলিং ও বসার বেঞ্চ রয়েছে। অত উঁচুতে সব সময় বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরছে ভক্তদের মাথার উপর। দেবী দর্শন করে যখন নামছি, নীচে দেখলাম এক অভাবনীয় দৃশ্য।

আমরা যেমন পুজো দেবার মানত থাকলে জোড়া ঢাক বাজিয়ে পুজোপকরণ নিয়ে দেবীর কাছে যাই— ওখানে দেখলাম ২০/৩০ জনের দলের নাকড়া বাদ্যের সঙ্গে বাঁশী, কাঁসর ও নাচওয়ালা দলযুক্ত একটি ব্যান্ড পার্টি। নাকড়ার শব্দে ও গুহার প্রতিধ্বনিতে একটা ঐন্দ্রজালিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। খবর নিয়ে জানালাম, কোনো ধনী ব্যবসায়ী কর্মে সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ দেবীর কাছে ওইভাবে মানত শোধ করতে এসেছে। আমরা বাংলায় মিঠা-সঙ্গীত, হাল্কা সুরের সঙ্গেই বেশি পরিচিত কিন্তু মারাঠী বীরত্বের ব্যঞ্জনা ওই ব্যান্ড বাদ্যের তালে তালে উচ্চারিত হচ্ছিল। দৃশ্যটি খুবই উপভোগ্য।

আমরা আবার ওই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম। সিঁড়ির দুপাশে পূজার উপকরণ, বিভিন্ন খাবার, ফল ও ঠাণ্ডা পানীয়ের অনেক দোকান রয়েছে। কাজেই পথের ক্লান্তি একেবারেই বোধ হলো না ওই সবের সৌজন্যে। লোনাভালা ছাড়তে ইচ্ছা করছিল না কোনোমতেই। কিন্তু সন্ধ্যা আগত প্রায়। পরেরদিন আমাদের ঘরে ফেরার ট্রেন। তাই বেদনার্ত হৃদয়ে স্মৃতিটুকু সম্বল করে লোনাভালাকে বিদায় জানালাম।

(লেখক বাঁকুড়া জেলার বাঁকাদহ হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক)

বিজ্ঞান মঞ্চ

ছি ছি এত্তা জঞ্জাল

বিমান নাথ

খবরটা শুনেই আমার স্ত্রী ধুলো ঝাড়ার সরঞ্জাম নিয়ে কাজে নেমে পড়েন আর কি! অনেক বুঝিয়ে নিরস্ত করতে হলো যে, প্রথমত, কাজে 'নামার' বদলে রকেটে চড়ে ওপরে উঠতে হবে, আর দ্বিতীয়ত, মহাবিশ্বে সর্বত্র এত ধুলো রয়েছে যে ঝেড়ে পরিষ্কার করার চেষ্টা বৃথা।

সম্প্রতি NASA-র পাঠানো Spitzer Space Telescope থেকে যে-সব তথ্য বিজ্ঞানীরা জোগাড় করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে মহাবিশ্বের আনাচে-কানাচে রয়েছে ধুলোর রাজত্ব। একেবারে মহাশূন্যে, নক্ষত্র জগতের অপরিসীম শূন্যতায়, যেখানে সবচেয়ে ঘন গ্যাসের ঘনত্বও আমাদের বায়ুমণ্ডলের তুলনায় কোটি কোটি গুণ কম, সেখানেও ধূলিকণা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটা যে খুব একটা নতুন খবর তা নয়—অনেকদিন ধরেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বে ধূলিকণা নিয়ে গবেষণা করছেন। তবে ধূলিকণা যে এভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকবে সেটা অপ্রত্যাশিত ছিল।

মহাবিশ্বে ধূলিকণা আমাদের হাটে-মাঠে-ঘাটে পড়ে থাকা ধুলোর মতোই গ্রাফাইট আর সিলিকেট দিয়ে তৈরি। আকারে মিটারে প্রায় এক কোটি গুণ ছোট। আর সেই কণাগুলিকে খানিকটা উত্তপ্ত করে তোলে আশপাশের নক্ষত্রের আলো। তবে আমাদের পৃথিবীর ধুলোর তুলনায় অনেক শীতল। এই তাপমাত্রাতে ধূলিকণাগুলি প্রচুর পরিমাণে অবলোহিত (Infrared) রশ্মি বিকিরণ করে। আর এই অবলোহিত রশ্মি নিরীক্ষণ করতেই Spitzer Space Telescope-টি পাঠানো হয়েছিল (সদ্য প্রয়াত জ্যোতির্বিজ্ঞানী Lyman Spitzer এই বিষয়ে প্রথম গবেষণা শুরু করেছিলেন বলে তাঁর নামে যন্ত্রটির নামকরণ হয়েছে)। এই পর্যন্ত যা জানা গেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে যে, মহাবিশ্বের যেসব অঞ্চলে নক্ষত্ররা জন্ম নিচ্ছে সেখানেই বেশিরভাগ ধুলো জমা রয়েছে। নক্ষত্রদের আঁতুড়ঘরেই সবচেয়ে বেশি জঞ্জাল। নক্ষত্র জগতে বোধহয় শুচিবায়ুর কোনো ব্যাপার নেই। বরং বিজ্ঞানীদের ধারণা এই ধূলিকণারাই নক্ষত্র সৃষ্টির যোগ্য পরিবেশ তৈরি করে। কণাগুলির গায়ে লেগে তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের অণু—ধূলিকণাগুলিই ঘটকালি করে নানান পরমাণুর মধ্যে মিলন ঘটায়। আর এই নতুন অণুগুলিই নক্ষত্র সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

ধুলোবালির জগতে কোনো বনধ্ নেই। সবার নজরের আড়ালে আমাদের ঘরে টেবিল-চেয়ারে আর বইয়ের তাকে ধুলো জমে— একের গায়ে আর একটি লেগে 'এত্তা জঞ্জাল' সৃষ্টি করে। মহাবিশ্বেও একই ব্যাপার ঘটেছে। নতুন নক্ষত্রদের চারিদিকে ধুলো জমে এবং কণাগুলি মিলে মিশে তার চারপাশে নতুন গ্রহ উপগ্রহ তৈরি করে। অর্থাৎ যে সব জায়গায় গ্রহ-উপগ্রহ-ধূমকেতুর ছড়াছড়ি, যেমন আমাদের এই সৌরমণ্ডল, এইসব এলাকা হলো মহাবিশ্বের আবর্জনাস্তূপ। কলকাতার যেমন ধাপার মাঠ। কয়েক সপ্তাহ আগে Spitzer এমনই একটি গ্রহ মণ্ডলের মধ্যে প্রচুর ধুলোর সন্ধান পেয়েছে। গ্রহমণ্ডলটি এখনও তার শৈশব কাটিয়ে ওঠেনি, আমাদের সৌরমণ্ডলের তুলনায় নেহাৎ অর্বাচীন। দেখা গেছে এই গ্রহমণ্ডলের নক্ষত্রের (আমাদের যেমন সূর্য) চারিদিকে ধূলিকণারা বলয়ের মতো ছড়িয়ে আছে— আর সেই জঞ্জালের মধ্যে যে ছোটোখাটো গ্রহ তৈরি হচ্ছে তারও পরিষ্কার চিহ্ন রয়েছে।

আরও একটি খবরে বিজ্ঞানীরা চমকে উঠেছেন। কিছু নতুন পর্যবেক্ষণে জানা গেছে যে, শুধু এখনকার মহাবিশ্বে নয়— অর্থাৎ শুধু তার গোধূলিলগ্নে নয়— তার ঊষাকালেও ধুলোর ছড়াছড়ি ছিল। যখন মহাবিশ্বের বয়স তার বর্তমান বয়সের প্রায় দশভাগের একভাগ ছিল, তখনকার কিছু গ্যালাক্সিতে প্রচুর ধূলিকণার আভাস পাওয়া গেছে। ধূলিকণা তৈরি হতেও তো কিছু সময় লাগে। মহাবিশ্বের জন্মের পর পরেই এত জঞ্জাল কী করে তৈরি হলো তা নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা চিন্তায় পড়ে গেছেন। অনেকের মতে মহাবিশ্বে গ্যালাক্সিদের বিবর্তনের সঙ্গে ধুলোবালির একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। জঞ্জাল জমলেই জন্মায় নক্ষত্র, আর নক্ষত্রের আলোয় গ্যালাক্সির পরিবেশ হয় জমজমাট। ধুলো না জমলেই দেখা যাচ্ছে সব কিছু মাটি। ভাগ্যিস ধুলো ছিল। ছিল জঞ্জাল। নাহলে পৃথিবীর কথা দূরে থাক, আমাদের সূর্যেরই জন্ম হোত না।

সৌজন্যে : দেশ

মনীষী কথা

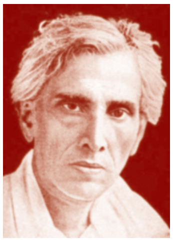

কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র

কথায় কথায় গল্পের ফোয়ারা ছোটাতেন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মজলিশী ও আড্ডাবাজ এই লেখক এতটাই গল্পরসিক ছিলেন যে তিনি নিজের জীবন নিয়েই সব অলীক গল্প ফাঁদতেন। তাই বন্ধুমহলে তাকে নিয়ে কৌতুহলের শেষ ছিল না। মাত্র সতেরো বছর বয়সে তিনি লেখেন 'দেবদাস'। পরে প্রকাশিত হয় চরিত্রহীন, পল্লীসমাজ, পথের দাবীর মতো বহু উপন্যাস। যা শরৎচন্দ্রকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে যায়।

এছাড়াও তিনি বহু গল্প লিখেছেন। তার 'রামের সুমতি' গল্পটি এখনও সমান জনপ্রিয়। শরৎচন্দ্রের জন্ম ১৮৭৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর, হুগলী জেলার দেবানন্দপুরে। তার কৈশোর, যৌবন কেটেছে বিভিন্ন জায়গায়। ভাগলপুর থেকে তিনি এন্ট্রান্স পাশ করেন। সেখান থেকে কলকাতায় আসেন এবং তারপর ব্রহ্মদেশ চলে যান। সমাজের বিভিন্ন অবিচার অনাচার নিয়ে তিনি সবসময় সরব থাকতেন। কখনও হতেন বিষণ্ণ, কখনও আবার উত্তেজিত। সমাজ বিষয়ক এই চিন্তার ছাপ পড়ে তার সাহিত্যে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে জগত্তারিণী পুরস্কার দেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দেয় ডি. লিট উপাধি।

প্রশ্নবাণ

১.ভারতীয় সংসদে বছরে কটি অধিবেশন বসে?

২.'সত্যমেব জয়তে' মন্ত্রটির উৎস কোন গ্রন্থ?

৩.গান্ধীবুড়ি কে?

৪.ভারতীয় রেলের মুখ্য কার্যালয় কোথায়?

৫.নীল দর্পণ কে রচনা করেন?

উত্তর : ১. তিনটি। ২. উপনিষদ। ৩. মাতঙ্গিনী হাজরা ৪. নতুন দিল্লী। ৫। দীনবন্ধু মিত্র।

ছবিতে অমিল খোঁজ

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) র ভ অ ণ্য

(২) তি ল ভা ক

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) তা দ র ব শা

(২) বা গী ক্য বা শ

২৩ নভেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) বিশ্ববিদ্যালয় (২) ইমনকল্যাণ

২৩ নভেম্বর সংখ্যার উত্তর

(৩) অকুতোভয় (৪) নিরক্ষরেখা

উত্তরদাতার নাম

(১) অনুশ্রী হালদার, ট্যাংরা, কলকাতা-৪৬ (২) অরিত্র নন্দ, এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর
(৩) সৌম্যকান্তি সাহা, বসিরহাট (৪) অমানীশ ধাড়া, হাওড়া

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : ৮৪২০২৪০৫৮৪
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

ঘরোয়া শিল্প সংস্কৃতির রক্ষায় মহিলাদের ভূমিকা

সুতপা বসাক ভড়

মাঝে-মধ্যেই চারদিকে গেল গেল রব ওঠে— বাংলার শিল্প- সংস্কৃতি ধরে রাখা যাচ্ছে না। আগের ঠাকুমা-দিদিমাদের মতো হাতের কাজ এখনকার মেয়ে-বউরা পারে না, ইত্যাদি। অথচ এইসব অতি চিন্তিত বুদ্ধিজীবীরা কাজের কাজ কি করছেন? তাঁরা নিজেদের বাড়ির মহিলাদের প্রাচীন শিল্প সংস্কৃতি বজায় রাখতে কতটা উৎসাহ দেন এবং নিজেরাই বা বাংলার সংস্কৃতি ধরে রাখতে কতটা সচেষ্ট জানতে ইচ্ছা করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এঁদের বাড়ির সদস্যারা খেলনা বানানো, কেক বানানো, বিদেশি রান্না শেখায় খুবই উৎসাহী। এইসব শখের জন্য তাঁরা মোটা টাকা খরচ করে থাকেন— বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এর ফল খুব একটা কার্যকরী হয় না, পরিবর্তে তাঁরা যদি আমাদের নিজস্ব শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে ভালমতো ওয়াকিবহাল হয়ে সেগুলি শিখতেন, তাহলে বোধহয় 'কথা কম, কাজ বেশি'-র সার্থক প্রয়োগ হোত।

পারম্পরিকভাবে বাঙালি মেয়ে-বউদের শিল্পকর্ম বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঘরে পড়ে থাকা জিনিসের পুনর্ব্যবহার করে। এতে খরচ সামান্য অথচ তা হলো অসীম সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ এবং অবশ্যই ব্যবহারযোগ্য, শুধুমাত্র সাজিয়ে রাখার জন্য নয়। আমাদের ঠাকুমা- দিদিমারা দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে যখন সবাই একত্রিত হতেন, তখনই হোত এইসব শিল্পের প্রকাশ। তাঁরা তো দূরদর্শন, কিটি-পার্টি, শপিং-মল ইত্যাদি পাননি, অবসর সময়ে প্রায়শই তাঁরা মেতে উঠতেন শিল্পকর্মে। তাঁরা বহির্মুখী ছিলেন না, ছিলেন অন্তর্মুখী। দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে নিজেরা এইসব শিল্পকর্মের মাধ্যমে নিজেদের শখ মেটাতেন। এখানে তাঁরা পেতেন সৃষ্টির আনন্দ, সেই আনন্দকে ভাগ করে নিতেন অন্যদের সঙ্গেও, ফলস্বরূপ একে অন্যকে সাহায্য করে নতুন কিছু শিখিয়ে দিতেন এবং নিজেরাও শিখে নিতেন। সেই শিল্পগুলির অধিকাংশই আজ লুপ্তপ্রায় হতে বসেছে। এক্ষেত্রে আমরা কি শুধুমাত্র মূকদর্শক হয়ে থাকব? সেগুলি পুনরুদ্ধারের কথা ভাববো না? শিল্পগুলিকে অনেকে পুরনোপন্থী বলে থাকেন, কিন্তু তা ঠিক নয়— এতো কেবলমাত্র পেছনে হাঁটা নয়, এ হলো পেছন থেকে সুশিক্ষা নিয়ে এগিয়ে চলা— তবেই সংস্কৃতি রক্ষা হবে। আমাদের সংস্কৃতি দেয় শান্তি— এ হলো সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টিকর্ত্রীর প্রেরণা এবং পথ চলার উৎস।

এমনই একটি দৃষ্টান্ত হলো কাঁথাশিল্প। পুরনো কাপড় সেলাই করে গায়ে চাপা দেবার জিনিস। ভীষণ আরামদায়ক। বর্তমানে খুব কম বাড়িতেই গায়ে দেবার কাঁথা পাওয়া যাবে, অথচ আগেকার মহিলারা এই কাঁথাগুলিতে

অঙ্গনা

সূঁচ-সূতো দিয়ে সুন্দর সুন্দর নক্‌শা, লেখা ফুটিয়ে তুলতেন--- অপূর্ব সুন্দর সেই কাঁথাগুলি আমাদের জীবন থেকে প্রায় মুছে গেছে। এখনও সদ্যোজাত শিশুর বিছানার জন্য কাঁথা অপরিহার্য। কাঁথা ছাড়া বাচ্চা বড় করার চিন্তাও করা যায় না। আসুন না, আমরাও চেষ্টা করি ওই শিল্পকে বাঁচিয়ে তুলতে।

আসন বানানো। চৌকো বা আয়তাকারে চটের টুকরো কেটে নিয়ে তার ওপর নানানরকমের কলাকৃতি বানানো ছিল আমাদের একটি প্রিয় শিল্প। আগে পুরানো ব্যবহৃত তাঁতের শাড়ির পার থেকে সুতো বের করে তাই দিয়ে নক্‌শা করা হোত। কালক্রমে এল লেছি সুতো, ক্রুচেট সুতো, উল ইত্যাদি। সুন্দর ওই আসনগুলি পূজা, শুভকাজ এবং বসার জন্য কার্যকরী ছিল। ওই কলাকৃতিগুলি আজকের দিনেও বসার জন্য, টেবিলক্লথ হিসাবে, ঘর সাজানোর কাজে ব্যবহার করা যায়। সেজন্য নতুন প্রজন্মকে শিখিয়ে রাখা ভাল। এই শিল্পের মাধ্যমে আমরা জিনিসের পুনর্ব্যবহার, নিজের হাতের উষ্ণতা, ভালবাসা দিয়ে সবাইকে খুশি করার চেষ্টা করতে পারি। বুদ্ধিজীবীরা হয়তো বলবেন, অনেক সুন্দর সোয়েটার বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি কি মা-কাকিমা-পিসিমা-মামিমার ভালবাসার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে? সেইরকম, ক্রুশের ব্যবহার করে শাল, নানান আসবাবের ঢাকা কি আগের মতো বানানোর চেষ্টা করা যায় না?

সূঁচ-সুতোর মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ শিল্পকর্ম কতগুলি পরিবার ধরে রেখেছেন? টেবিল-ক্লথ, বিছানার চাদর, সোফার ঢাকা, শাড়ি, শাল, ওড়না ইত্যাদিতে বৈচিত্র্য আনতে এই শিল্পের তুলনা নেই। একবার একজন উচ্চশিক্ষিতা মহিলা খুব সুন্দর একটি শাল গায়ে দিয়েছিলেন। অপূর্ব সুন্দর ওই শালটি ছিল তাঁর পুরনো তাঁতের শাড়ির আঁচল কেটে বানানো।

এরপর আসি আলপনা প্রসঙ্গে। বাড়ির অল্পবয়সী মেয়ে-বউরা উৎসবের দিনে সুন্দর আলপনা দিয়ে বাড়ি সাজাতো। ময়দা মেশানো চালগুড়ো দিয়ে তৈরি এই আলপনার সঙ্গে আজকাল বাজারে প্রাপ্ত চাইনিজ স্টিকারের কি কোনো তুলনা হয়? তাদের হাতে বানানো লক্ষ্মীর চরণচিহ্ন ধরে যেন স্বয়ং মা-লক্ষ্মীর গৃহপ্রবেশ হোত।

বর্তমানে যাঁরা খেলনা বানানো, কেক বানানো, বিদেশি রান্না শিখতে যান, তাঁরা বলুন তো, সেগুলি কি আমাদের উপরোক্ত শিল্পকৃতিগুলির সঙ্গে কার্যকারিতা এবং শিল্পবোধের তুলনাত্মক বিচার করলে আদৌ টিকতে পারবে? নিজেদের শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের নিজেদের। বস্তুভিত্তিক, অর্থকরী জীবনশৈলী কখনই আমাদের মন ভরাতে পারেন না। সেজন্যই কড়ি দিয়ে হয়তো দুনিয়াকে কেনা যায়, কিন্তু সুখ-শান্তি-ভালবাসাকে নয়। এই ভালবাসাকে কি বাঁচিয়ে রাখা যায় না? মানুষ চলে যায় কিন্তু স্মৃতি রেখে যায় তার সৃষ্টির মধ্যে— পরের প্রজন্ম সেই সৃষ্টি থেকে নতুন করে শেখে তারপর শেখায় তার আগামী প্রজন্মকে— এইভাবেই যুগ-যুগান্ত ধরে বয়ে চলে একটি সুস্থ সুন্দর সংস্কৃতি এবং শিল্প। শিল্প ভক্তির প্রকাশ— বৃদ্ধাবস্থায় ঠাকুমার হাতের শেষ শিল্পকর্ম ছিল অতি সাধারণ চটের টুকরোর ওপর উল দিয়ে বানানো আসন— শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দকে উৎসর্গ করেছিলেন। আজ ঠাকুমা নেই। আছে তাঁর একাগ্র ভক্তির নিবেদন সেই আসন, আর আছেন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জিউ— এখনও ওই আসনে বিরাজমান।

অতিথি কলম

জয় পণ্ডা

সংসদীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি ও ভারসাম্য রক্ষার সামঞ্জস্য একান্ত জরুরি

জনগণের দেওয়া অধিকারকেও একলপ্তে বানচাল করে দেওয়ার রাজ্যসভার অবিমিশ্র অধিকারকে খর্ব করা একান্ত জরুরি। এই প্রচলিত পদ্ধতির আশু সংস্কারের প্রয়োজন কেননা পৃথিবীর কোথাও তা চালু নেই।

গত মাসেই ইতালীয় সেনেট (মজার কথা তারা নিজেরাই উচ্চকক্ষ) তাদের নিজেদের সদস্যদের ক্ষমতা ছাঁটাই করল। এক ধাক্কায় কমিয়ে দেওয়া হলো উচ্চকক্ষের (আমাদের রাজ্যসভা) সদস্য সংখ্যা ও সেই সঙ্গে নিম্নকক্ষে পাশ হওয়া দেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো আইন এমনকী সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিলকে আটকে দেওয়ার ক্ষমতাও লোপ করা হলো। যদিও কোনো আপতকালীন ক্ষেত্রে গণভোট নেওয়ার আইন আগের মতই বলবৎ রইল। বলা দরকার এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমেই শেষ হলো দীর্ঘকাল ব্যাপী চালু থাকা এক তালগোল পাকানো শাসন পদ্ধতির।

> “ইতালির মতোই ভারতের সংসদীয় শাসনপ্রণালী আজ দীর্ঘদিন ধরে কচুরিপানায় আটকে যাচ্ছে— যেখানে উচ্চকক্ষের বাধা দেওয়ার চেষ্টাই শুধু বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে ভারসাম্য রক্ষা করার বিষয়টির যেন কোনো গুরুত্বই নেই।”

ঘটনাটা আমাদের দেশের পক্ষে খুবই অনুধাবনযোগ্য। আমরা তো বহুকাল ধরেই এই তালগোল পাকানো শাসন প্রক্রিয়ার সঙ্গেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। সেই কারণে বর্তমান অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি রাজ্যসভার ক্ষমতা ও অধিকার নিয়ে নতুন করে বিচার-বিবেচনার প্রসঙ্গটি তোলামাত্র রে রে করে উঠেছে নানান স্বার্থান্বেষী মহল। বাধা দেওয়া, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা চলতেই পারে। কিন্তু তা অবশ্যই যুক্তিনিষ্ঠ হতে হবে। কোনো গোঁড়ামি বা বদ্ধমূল ধারণা বা এমনটাই চলে আসছে তাই অলঙ্ঘনীয় এগুলি কু-যুক্তি। কোনো শাসন প্রণালীই সবসময়ের জন্য শ্রেষ্ঠ তা হতে পারে না।

প্রথমেই আমাদের মানতে হবে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিরোধীদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ও ভারসাম্য রক্ষার ওপরই এর সাফল্য নির্ভর করে। ঠিক সেই কারণেই একটি দ্বি-কক্ষীয় আইনসভার ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা হয়। যেখানে নিম্নকক্ষ সরাসরি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত। তাই তাদের আশা- আকাঙ্ক্ষার প্রতিভূ হয়ে সংসদে প্রতিনিধিত্ব করবে। অন্য কক্ষ অর্থাৎ উচ্চকক্ষ আরও গভীর বিচার-বিবেচনা সাপেক্ষে জনগণের প্রতিভূ প্রতিনিধিদের আইনগুলিকে অনুমোদন করবে। যাতে মনে না হতে পারে একটা বিশেষ সময়ে কিছুটা আবেগতাড়িত বা উত্তেজনার মাথায় কোনো আইনি সিদ্ধান্ত তাড়াহুড়োয় নেওয়া হলো অনেকটা তাৎক্ষণিক জনতার দাবি মেটাতে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় আগে বলা ঠিক— ইতালির মতোই ভারতের সংসদীয় শাসনপ্রণালী আজ দীর্ঘদিন ধরে কচুরিপানায় আটকে যাচ্ছে— যেখানে উচ্চকক্ষের বাধা দেওয়ার চেষ্টাই শুধু বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে ভারসাম্য রক্ষা করার বিষয়টির যেন কোনো গুরুত্বই নেই।

নজর করলে দেখা যাবে পৃথিবীর আর কোনো দেশে একটি জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত আইনসভার অন্য একটি কক্ষের তুমুল বাধায় আটকে যাচ্ছে এমন নজির নেই। এ প্রসঙ্গে উভয়পক্ষের মিলিত অধিবেশনে সংখ্যাধিক্য প্রমাণ বারবার প্রয়োগ করার মতো আদৌ বাস্তবোচিত পদ্ধতি নয়। বিশেষ করে সংবিধান সংশোধনকারী কোনো আইন এই পদ্ধতিতেও পাশ করানো যায় না। দরকার দুই তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা। আর বিভিন্ন আইন রাজ্যসভাকে পাশ কাটাতে সর্বদা Money Bill-এর মোড়ক দিয়ে পাশ করানোর চেষ্টাও আদতে অপচেষ্টা।

এখন প্রশ্ন ওঠে, অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশগুলি এ বিষয়ে কী করছে। ইংল্যান্ডের

কথা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। বৃটিনের ওয়েস্ট মিনিস্টার মডেলের আদলেই আমাদের সংবিধানের গরিষ্ঠাংশ তৈরি। আজ থেকে একশো বছর আগে বিলেতের হাউস অফ লর্ডস ছিল অসীম ক্ষমতাধারী। তারা আমাদের রাজ্যসভার মতোই মানি বিল ছাড়া যে কোনো বিলকে ইচ্ছে করলেই আটকে দিতে পারত। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করে সাহেবরা ১৯১১ সালে হাউস অফ লর্ডস-এর ক্ষমতায় কোপ দেয়। বরাবর আটকানো তো দূরে থাক তারা কেবলমাত্র দু' বছর কোনো বিলকে পাশ না করে আটকে রাখতে পারে। ১৯৪৯ সালে আবার দ্বিতীয়দফা ছাঁটাই প্রক্রিয়ার ফলে তাদের ক্ষমতা আরও কাটছাঁট করা হয়। এখন তারা মাত্র ১ বছরই কোনো বিল বা আইন আটকে রাখতে পারে।

এই হাউস অফ লর্ডস-ও কিন্তু আমাদের রাজ্যসভার মতোই নিযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত আদৌ নির্বাচিত নয়। এখন সেদেশেও এই প্রণালীতে পরিবর্তনের কথা আলোচনার স্তরে রয়েছে। আর এ বিষয়ে আমাদের দেশে তুমুল বিভ্রান্তি তৈরি করা হচ্ছে। যাঁরা রাজ্যসভার এই একরোখা বা আপোশবিমুখ মনোভাবের বিরোধী তাঁরা বলছেন এখানকার মনোনীত সদ্যসেরা কেউই জনতার দ্বারা নির্বাচিত নন। এঁদের এমন অবিমিশ্র ক্ষমতা থাকা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়।

এটিও কিন্তু কিছুটা ভুল ধারণা। রাজ্যসভার ২৪৫ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ১২ জনই মনোনীত, বাকিরা সকলেই নির্বাচিত। অবশ্যই সরাসরি জনতার ভোটে নয়, রাজ্যের বিধানসভাগুলির সদস্যরা তাঁদের নির্বাচিত করে পাঠায়। এই তফাতটিই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও বিতর্কের দাবি রাখে। বস্তুতপক্ষে রাজ্যসভায় পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হওয়া মানেই দলের মনোনীত হয়ে যাওয়া। সাম্প্রতিককালের দু'টি বিশেষ ঘটনায় এই বিষয়টা অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে গেছে। বিরোধী কার্যকলাপের ক্ষেত্রে হর্স ট্রেডিং বা ঘোড়া কেনাবেচা রুখতে Party whip-কে সর্বশক্তিমান করা হয়েছে। Whip না মানলে বহিষ্কার অবশ্যম্ভাবী। এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে ২০০৩ সাল থেকে গোপন ব্যালট প্রক্রিয়া উঠে যাওয়া। এখন রাজ্যের এমএলএ-রা কখনই তাদের মনোমতো কোনো রাজ্যসভার প্রার্থীকে গোপন ব্যালটে ভোট দিতে পারেন না। এর ফলে দল মনোনীত প্রার্থীই নির্বাচিত হন। কোনো আলাদা ভাবমূর্তির দলহীন স্বাধীন প্রার্থীর নির্বাচিত হওয়ার আর প্রশ্নই নেই।

তত্ত্ব অনুযায়ী রাজ্যসভায় নিযুক্ত প্রার্থীরা সেই রাজ্যেরই সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন করবেন। কিন্তু বাস্তবে তাঁরা শুধু দলেরই প্রতিনিধিত্ব করেন, আরও মাইক্রো লেভেলে বললে বলতে হয় তাঁরা কেবলমাত্র নেতা-নেত্রীরই লোক।

পৃথিবীর অন্যান্য গণতন্ত্রে এমন পরিস্থিতি দেখা গেছে এবং তারা তাদের মতো করে এর সমাধানও করেছে। উদাহরণ দিলে প্রথমেই আসবে মার্কিন সেনেটের কথা। যা ঠিক আমাদের রাজ্যসভার ৬ বছর মেয়াদি সদস্যদের মতোই। প্রথম দিকে এই সেনেটে সদস্যরা আমাদের এখানের মতোই বিভিন্ন রাজ্য থেকে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হতেন। কিন্তু ১৯১৩ সালে যখন আমেরিকায় নানান রাজনৈতিক উদারিকরণের পথ নেওয়া হলো তখনই এই পদ্ধতিরও সংস্কার হয়। দেশের সংবিধান সংশোধন করে নতুন আইনে সেনেটের সমস্ত প্রতিনিধিদের আমেরিকার নানান রাজ্য থেকে সরাসরি জনতার দ্বারা নির্বাচিত হয়ে আসার বিধান সেই থেকে চালু আছে।

এর ফল হলো নাটকীয়। দেশের তাবড় রাজনীতিবিদরা জনতার সঙ্গে সম্পর্কহীন কেবলমাত্র তাঁদের নিজেদের স্তাবক বা ধামাধরাদের আর গালভরা পদ দিতে পারলেন না। তার ফলে বর্তমান সেনেটে সদস্যদের রাজ্যের কোণায় কোণায় ঘুরে ভোট সংগ্রহ করে প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে তবে সদস্যপদ জোটাতে হয়।

আজকে ভারতেরও সময় হয়েছে যে কোনো একটা রাস্তা বেছে নেওয়ার যাতে এই যুগব্যাপী বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক বদ্ধ জলাশয় থেকে বেরোনো যায়। যদি ইতালি বা ইংল্যান্ডের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় সেক্ষেত্রে রাজ্যসভার নির্বাচন পদ্ধতি যেমন আছে তাই থাকবে। কিন্তু সদস্যদের ক্ষমতা ছাঁটাই হবে। অবশ্যই কোনো আইনে লাগু হওয়াকে শ্লথ করে দেওয়ার ক্ষমতা তাঁদের থাকবে যাতে যাঁরা নির্বাচন জিতে এসেছেন তাঁরা যেন যা খুশি আইন প্রণয়ন করে হাতে মাথা না কাটতে পারেন। হেরো যেন তলিয়ে না যায়। কিন্তু অনন্তকাল কোনো বিলকে ধরে রেখে বাস্তবে সেটির মৃত্যু ঘটিয়ে নির্বাচিত শাসকদলের কার্যধারায় পূর্ণ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাঁদের থাকবে না। অর্থাৎ লোকসভার নির্বাচিত গরিষ্ঠাংশ জন প্রতিনিধিদের সিদ্ধান্তকে এই নিযুক্তরা আর ভেটো দিতে পারবে না।

আবার মার্কিন পদ্ধতি অনুসরণ করলে রাজ্যসভার সদস্যদের ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা অটুট থাকবে কিন্তু তাঁদের মাঠে ঘাটে ঘুরে জনতার ভোট জোগাড় করে নিয়ে আসতে হবে। এতে তাঁদের কাজের উদ্দেশ্যও সরাসরি জনতার ইচ্ছেকেই প্রতিফলিত করবে।

কিন্তু এই ব্যবস্থার যে কোনো একটিকে বাস্তবায়িত করতে গেলে প্রথমেই দরকার হবে বিষয়টির গুরুত্ব দেশব্যাপী প্রচার করা। যেমনটা ১০০ বছর আগে করেছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট বা সদ্য দু' বছর ধরে এরকমই করলেন ইতালিয় প্রধানমন্ত্রী Matteo Renzi। উল্লেখিত দুটি ক্ষেত্রেই কিন্তু শাসকদল তার একার চেষ্টায় এই বিরাট সংস্কার আনতে পারেনি। এক্ষেত্রে বিরোধীদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য, বিশেষ করে সেই রকম বিরোধীদের তো বটেই যারা নিকট ভবিষ্যতে আবার শাসক হতে চায়। ■

স্বচ্ছ গ্রাম থেকে স্বচ্ছ ভারত তৈরিতে নিরক্ষরকে অক্ষরদান করাটাই দায়িত্ব পালন : সীতারামজী

সম্প্রতি অর্থাৎ নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সীতারামজী কেদিলাই উত্তরবঙ্গে এসেছেন। এর আগেও এসেছেন। ক'দিন আগে বর্ধমান, বীরভূম জেলাও ঘুরে গেছেন। কিন্তু এবার এলেন অন্যবেশে অন্যভাবে। সবাই বলছেন সন্ত সীতারামজী। পরণে গেরুয়া, স্বাভাবিক নিয়মে বেড়ে ওঠা লম্বা লম্বা চুল দাড়ি শোভিত তেজোদীপ্ত চেহারা। গত তিন বছর ধরে পায়ে হেঁটে অতিক্রম করছেন মাইলের পর মাইল। তবুও ক্লান্তি নেই। এ যেন তীর্থ ভ্রমণ। মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময় নিঃসৃত বাক্যে দরদ ও আন্তরিকতার জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে ভাষা সমস্যা। মূলত সমাজের মুখিয়া, দুখিয়া (দুঃখী), সাধক শ্রেণীর মানুষদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মিলিত হয়ে বার্তা দিতে চাইছেন। চাইলে যে কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারছেন। না, কোনো চিরাচরিত ধর্মীয় আচারের বালাই নেই। এ যেন আপনজনের সঙ্গে কথা বলা। নতুন নতুন গ্রামে কমপক্ষে পাঁচটি বাড়িতে উপস্থিত হয়ে গ্রাম পরিক্রমা, গ্রামবাসীদের নিয়ে গ্রাম সভা, যুব সম্মেলন, মাতৃসম্মেলন, পরিবার প্রবোধনের মতো নানা কর্মসূচিতে ঠাসা থাকছে প্রতিটি দিন। সন্ত সীতারামজীর এ হেন ভারত পরিক্রমা পদযাত্রা গত ৯ আগস্ট ২০১২ সালে কন্যাকুমারী থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন রাজ্য, চার ধাম, প্রধান প্রধান ধর্মীয় ক্ষেত্র হয়ে বিহার থেকে দার্জিলিং জেলার খড়িবাড়ি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছেন। আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারীহাটে স্বল্প সময়ের জন্য স্বস্তিকার প্রতিনিধি হিসেবে সাধন কুমার পাল এই পরিক্রমায় সামিল হয়েছিলেন। এখানেই বিশ্রামের সময় কিছুক্ষণ একান্তে কথা বলার তাঁর সুযোগও হয়েছিল। আলাপচারিতার পাশাপাশি স্বস্তিকার পাঠকদের কাছে তুলে ধরবো— এমন প্রস্তাবে একটি সাক্ষাৎকার দিতে রাজিও হয়ে গেলেন। সেই সাক্ষাৎকারটি এখানে প্রকাশ করা হলো।

শুনলাম গতকাল আপনি শিশুবাড়িতে স্থানীয় এক মাদ্রাসার মৌলবির সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ একান্তে কথা বলেছেন। আপনি একজন সন্ত, হিন্দুসমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘেরও সর্বভারতীয় কার্যকর্তা ছিলেন। কী উদ্দেশ্য নিয়ে আপনি মুসলমান সমাজের ধর্মগুরুর সঙ্গে কথা বললেন এবং কী বার্তা দিতে চাইলেন?

পরিক্রমা চলার সময় আমি কে মুসলমান, কে খৃষ্টান এসব বিচার না করে একজন মানুষ, একজন ভারতীয় হিসেবে সবার সঙ্গে কথা বলি। দেশ গঠনে সবার ভাবনা চিন্তা অবগত হয়ে গ্রাম সুরক্ষার কিছু বার্তা দেওয়াই আমার মূল উদ্দেশ্য। যেমন বহুমুখী উপযোগিতার বিষয়টি বিশদ ব্যাখ্যা করে গোহত্যা নিয়ে প্রশ্ন করাতে এই মুসলমান ধর্মগুরু জানালেন যে, কোরানে গোহত্যার কথা বলা নেই। কোরানের বিভিন্ন আয়াত উল্লেখ করে ওই ধর্মগুরু বোঝানোর চেষ্টা করেন সবাই মিলেমিশে শান্তিতে থাকুক এটাই ইসলামের মূল বার্তা। ভগবান বুদ্ধও ভয়ানক নরহত্যাকারী অঙ্গুরীমালের ভেতর মানবতা জাগ্রত করেছিলেন। সমাজের সমস্ত মানুষের মধ্যেই দেবত্ব আছে, সেটাকে জাগ্রত করাই আসল উদ্দেশ্য।

আপনি কি জানেন পশ্চিমবঙ্গের ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার গোরু পাচার হয়ে যাচ্ছে....

হ্যাঁ। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে পারে যদি আমরা মোবাইল ফোন, টিভি ফ্রীজের মতো গোরুকেও গৃহপালিত প্রাণী হিসেবে নিজের পরিবারের অঙ্গ মনে করি। এটা করা দরকার মানব সভ্যতাকে রক্ষা করার জন্য। ইলেকট্রনিক ব্যবহার্যগুলি আপাত মধুর হলেও এরা কিন্তু মানব সভ্যতাকে ধীরে হলেও হুমকির মুখে দাঁড় করাচ্ছে। যে ট্রাক্টর দিয়ে আমরা চাষ করছি সেটি আসলে রাক্ষস। চাষ করার সময় উপকারী অদৃশ্য জীবগুলিকে হত্যা করছে। খনিজ তেল খাচ্ছে, পরিবেশ দূষণকারী ভয়ঙ্কর নিঃশ্বাস ফেলছে, শব্দদূষণ করছে। প্রাত্যহিক জীবনে গোরুর অর্থনৈতিক গুরুত্ব বাড়াতে হবে। তাহলে যে অর্থনৈতিক কারণে গোরু পাচার হচ্ছে, পাল্টা অর্থনৈতিক কারণেই সেটি বন্ধ হয়ে যাবে।

আপনি ভারত পরিক্রমা পদযাত্রার মাধ্যমে কী বার্তা দিতে চাইছেন?

আমি গ্রামে গিয়ে মুখিয়া, দুখিয়া (দুঃখী), সাধক, যুবক-যুবতী, মাতৃমণ্ডলী-সহ সমস্ত শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে গ্রাম সুরক্ষার ব্যাপারে বার্তা, গ্রামের মানুষের নিজের প্রয়াসেই কীভাবে গ্রামের উন্নয়ন সম্ভব সেই বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করছি। এর জন্য গ্রাম সভা, যুব সম্মেলন, পরিবার প্রবোধন, প্রত্যক্ষ ভাবে পরিবার সম্পর্কের কার্যক্রম প্রতিদিনই থাকছে। ভূমি সংরক্ষণ, জল সংরক্ষণ, জঙ্গল সংরক্ষণ, গ্রাম সংস্কৃতি সংরক্ষণ, গো-সম্পদ সংরক্ষণ, জীব সম্পদ সংরক্ষণ, কুটির শিল্প সংরক্ষণ ও গ্রাম বৈদ্য পরম্পরা সংরক্ষণ--- এই অষ্ট সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সংকল্পবাক্য পাঠ করানো হচ্ছে গ্রামে গ্রামে। এই সম্পদ বাঁচলে গ্রাম বাঁচবে, গ্রাম বাঁচলে ভারত বাঁচবে।

এছাড়াও ছয়টি বিশেষ ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়ার বার্তা দিচ্ছি, চেষ্টা করছি। বলছি গ্রামের প্রত্যেক বাসিন্দাদের প্রতিদিন স্বেচ্ছা শ্রমদান করে গ্রামবাসীদের নিজেদের গ্রাম নিজেদেরই গড়তে হবে। প্রতিদিন আধঘণ্টা সময় দিয়ে স্বচ্ছ গ্রাম বানাতে হবে। স্বচ্ছ গ্রাম থেকেই স্বচ্ছ ভারত তৈরি হবে। গ্রামের প্রতিটি শিক্ষিত মানুষকে কমপক্ষে একজন নিরক্ষরকে অক্ষরদান করার দায়িত্ব পালন করতে হবে। যাতে সম্পূর্ণ সুশিক্ষিত গ্রাম গড়ে তোলা যায়। গ্রামের ক্ষুধার্তকে খাইয়ে খাব এমন সংস্কৃতি গড়ে তোলা যাতে ক্ষুধামুক্ত গ্রাম গড়ে তোলা যায়। ক্ষুধামুক্ত গ্রাম হলে ক্ষুধামুক্ত ভারত হবে। গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তিকে সবুজ রক্ষা করা ও সবুজ বৃদ্ধিতে সক্রিয় হতে হবে। এর জন্য প্রত্যেককে কমপক্ষে একটি করে চারা গাছ রোপণ ও সংরক্ষণ করতে হবে। গ্রামের শিক্ষিত সজ্জন মানুষদের তাদের কাছে যেতে হবে যারা ভুল করে চুরি করা, জুয়া খেলা, তাস খেলা, মদ্যপান করা, তামাক খাওয়ার মতো খারাপ কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে। তাদের প্রথমে ভালোবাসার সঙ্গে বোঝাতে হবে, কাজ না হলে ভয় দেখিয়ে প্রয়োজনে মারধোর করে হলেও তাকে সেই ভুল রাস্তা থেকে সরাতে হবে। এতে চরিত্রবান নেশা মুক্ত গ্রাম তৈরি হবে। একে আমরা বলি বিদ্যাদান।

গ্রামের সব মানুষকে ভগবান জ্ঞানে সেবা করা যাতে সমরস গ্রাম তৈরি হয়। একে বলা হয় জীবন দান। এই ছয়টি কাজ যদি গ্রামবাসী প্রতিদিন করে তবে এক একটি গ্রাম আদর্শ গ্রামে পরিণত হবে। উপর থেকে দৈবশক্তির প্রভাবে গ্রামগুলি স্বর্গে পরিণত হবে। ভারতে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। বিশ্বের কল্যাণ হবে। এরকম কিছু ব্যবহারিক কথা গ্রামের যুবশক্তিকে, মাতৃশক্তিকে বলা হচ্ছে।

সবুজ বিপ্লবের কুফলের ফলিত রূপ এখন পাঞ্জাবে দেখা যাচ্ছে। সেখান থেকে ক্যান্সার আক্রান্তদের চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে যাতায়াতের ট্রেন 'ক্যান্সার ট্রেন' বলে অভিহিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনি কি বিশেষ কোনো বার্তা দিচ্ছেন?

হ্যাঁ, আমার জাগরণ কর্মসূচির একটি বিন্দু হচ্ছে ভূ-সম্পদ বাঁচাও। কৃষি জমি হাতছাড়া করার মতো পাপ না করা ভারতের পরম্পরা। তাই গো-নির্ভর জৈবিক কৃষি করার পক্ষে বক্তব্য রাখছি। রাসায়নিক সার, কীটনাশক ওষুধ জমির ফসল, জল সব কিছুকেই বিষাক্ত বানিয়ে দিচ্ছে। এতে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে, মানুষ ক্যান্সার-সহ নানা ভয়ঙ্কর সব রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। সেই রোগ সারাবার জন্য যে সমস্ত ওষুধ খাচ্ছে তাতে ওই রোগ সারলেও নতুন করে আরও রোগ তৈরি হচ্ছে। এ এক চক্র। সন্দেহ নেই ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র এই চক্রের পেছনে রয়েছে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি। এরা রাসায়নিক সার উৎপাদন করে পয়সা লুটছে আবার ঔষধ উৎপাদন করেও পয়সা লুটছে। এই ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় গো-ভিত্তিক জৈব কৃষির প্রচলন। কৃষি জমি অন্য কোনো কাজে ব্যবহার না করা, বৃহত্তর স্বার্থ ছাড়া অন্য কোনো কাজের জন্য কৃষি জমি হাত ছাড়া করাটা পাপ— এই বার্তাও আমি স্পষ্ট করে জোরের সঙ্গেই দিচ্ছি।

বর্তমানে দেশের মা-বোনেরা যেভাবে পাশবিক ক্রিয়াকলাপের শিকার হচ্ছে এটা কীভাবে রোধ করা সম্ভব?

আমার যাত্রায় মাতৃশক্তির বিশেষ জাগরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রায় প্রতিদিনই মা-বোনেদের কমপক্ষে কুড়ি পঁচিশজনের একটি দল নিজেরাই এগিয়ে এসে উৎসাহ সহকারে এই যাত্রার বিজয় ধ্বজ তুলে ধরে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে পৌঁছে দিচ্ছে। এটি অবশ্যই মাতৃশক্তির জাগরণের একটি বিশেষ লক্ষণ। আমার মনে হয়, মাতৃশক্তির জাগরণের মাধ্যমেই মায়েদের বোনেদের উপর সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করা যেতে পারে। 'জাগেগি জাগেগি মাতৃশক্তি জাগেগি/মাতৃশক্তি জাগেগি তো ভারতমাতা জাগেগি।' একমাত্র শক্তিশালী নারী সমাজই তাদের উপর সমস্ত রকম অত্যাচার অবিচারের অবসান ঘটাতে পারে। এর জন্য নারীদের বেশি করে কাজের দায়িত্ব দিতে হবে। নারীশক্তি এক বিরাট শক্তি। এর জন্য ভারতবর্ষে মাতৃশক্তি হিসেবে নারীদের পূজা করা হয়। 'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তি রূপেণ সংস্থিতা।' নারী যে শুধুমাত্র একজন স্ত্রী নয়, তাদের মধ্যে যে আদ্যা শক্তি মহামায়ার বিরাট শক্তি রয়েছে এই ভাব নারীদের মধ্যে জাগাতে হবে।

আপনি সঙ্ঘের সর্বভারতীয় দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে এরকম একটি যাত্রায় বেরোলেন কেন?

সঙ্ঘের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে আমি সঙ্ঘেরই কাজ করছি। আমি যে সমাজ জাগরণের কাজ করছি এটাও সঙ্ঘেরই কাজ। ডাক্তারজীও এক সময় সরসঙ্ঘচালকের দায়িত্ব অন্যকে দিয়ে সত্যাগ্রহ করে জেলে গিয়েছিলেন এবং জেলকে সঙ্ঘময় করে তুলেছিলেন। তাছাড়া একসঙ্গে দু'টো দায়িত্ব থাকলে দু'টোর প্রতিই অবিচার করা হয়।

আপনার এই যাত্রা মানুষ কীভাবে নিচ্ছে, কতটা উপকৃত হচ্ছে?

নদী বয়ে চলে। নদীর জলে মানুষ তৃষ্ণা মেটায়, স্নান করে শীতল হয় স্নিগ্ধ হয়, জলসেচ করে ফসল ফলায়। এর থেকে যে জীবকুল কতরকম উপকার পায় সেটা হিসেব করে বলা মুশকিল। আমার এই যাত্রায় সবই থাকছে, এর থেকে মানুষ কীভাবে উপকৃত হবে সেটা তাকেই ঠিক করতে হবে।

আপনার যাত্রা কবে শেষ হবে?

সেরকম কোনো সময়সীমা ঠিক করিনি।

ভারতের বাইরেও যাওয়ার পরিকল্পনা আছে কি?

না। এটা মূলত ভারত পরিক্রমা যাত্রা।

হিন্দু শাস্ত্রগুলির পুনঃ অধ্যয়ন প্রয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আমাদের দেশে কমিউনিস্টরা গত প্রায় একশো বছর ধরে প্রকৃতপক্ষে হিন্দু শাস্ত্রের নেতিবাচক আলোচনায় মুখর। তাদের মননে হিন্দু শাস্ত্রের সদর্থক এবং জীবন সংগ্রামের সহায়ক দিকগুলি অগ্রাহ্য করার এক ধরাবাহিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে মেকলে প্রবর্তিত চিন্তাভাবনার অনুসারী স্বদেশি এবং বিদেশি পণ্ডিতরাও একই মনোভাব পোষণ করেন। যদিও আধুনিককালে হিন্দুশাস্ত্রগুলি যে সদর্থক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবনশৈলী এবং বিকশিত চিন্তনের আধার তা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্বীকৃতি পাচ্ছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্কৃতি তার ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ, লোকাচারকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়। কিন্তু ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতিতে কোনো সাধারণ বিশ্বাস-এর স্থান নেই। কোনো নির্দিষ্ট মতবাদ (যেমন—বৌদ্ধ, জৈন, চার্বাক, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি) ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি। এমনকী বেদসমূহ বা শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার কোথাও 'হিন্দু' শব্দের উল্লেখ নেই। যেহেতু হিন্দুধর্মের কোনো নির্দিষ্ট গ্রন্থ নেই, তাই সুনির্দিষ্টভাবে কোনো নিয়ম অনুপস্থিত। তার বদলে ভারতীয় জীবনচর্যা সম্পৃক্ত হয়েছে বহুবিধ বিশ্বাস ও চিরায়ত মূল্যবোধের আধারে। যেমন—সত্যবাদিতা, অচৌর্য, অহিংসা ইত্যাদি। ভারতীয় সংস্কৃতি বহু মতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তার সরাৎসারকে নিজ সংস্কৃতির মধ্যে আত্মস্থ করে নেয়। ফলে আমাদের দেশের কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনে বহু দেবদেবীর উদ্ভব ঘটলেও তাদের মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না। কালীও যেমন কখনও কখনও হয়ে উঠেছে বৈষ্ণবদের উপাস্য, তেমন শাক্ত ও শৈবদের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও সংঘাত ছিল না বললেই চলে। তাই গর্বের সঙ্গে আমরা দাবি করতে পারি, 'একম্ সদ্, বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি' অর্থাৎ সত্য এক, পণ্ডিতেরা একে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন।

ভারতীয় জনমানসে প্রচলিত ধারণানুযায়ী মানুষের জীবনের সামান্য থেকে সামান্যতম ঘটনাও নিয়ন্ত্রিত হয় পরমেশ্বরের দ্বারা; 'তাঁর ইচ্ছা ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে না।' জীবনের যে কোনো ঘটনাকেই আমরা বিধি বা ঈশ্বরেচ্ছা বলে মেনে নিই। আর এই মনোভাবই বহির্জগতের কাছে আমাদের উপর 'অদৃষ্টবাদী'-র তক্মা এঁটে দিয়েছে। অহিন্দুর কাছে এরূপ প্রতিভাত হয় যে ভারতীয় সমাজে 'ইচ্ছা'-র কোনো দাম নেই। যদি প্রত্যেক মানুষের সব কাজই ঈশ্বর বা বিধির দ্বারা পূর্বনির্ধারিত হয়ে থাকে, তবে সংগ্রাম বা পরিশ্রমের মূল্যই বা কী?

কিন্তু যদি আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিকে তাকাই তবে দেখবো যে কোনো কালেই এই সুপ্রাচীন সভ্যতা অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে সুপ্ত ছিল না, দুর্বল ছিল না। বরং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ তাঁদের জড়বাদের দৃষ্টিতে ভারতীয় দর্শনকে ভুল দৃষ্টিতে অবলোকন করেছেন। ("পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে স্থূলজগৎ ভিন্ন অন্য জগৎ নাই, স্থূলের উপর সূক্ষ্ম প্রতিষ্ঠিত। সূক্ষ্ম অনুভব, স্থূল অনুভবের প্রতিকৃতিমাত্র, মনুয্যের স্বাধীনতা-প্রয়াস ব্যর্থ; ধর্মদর্শন বেদান্ত অলীক কল্পনা, সম্পূর্ণ ভূতপ্রকৃতি-আবদ্ধ আমাদের সেই বন্ধনমোচনে বা ভূতপ্রকৃতির সীমা উল্লঙ্ঘনে মিথ্যা চেষ্টা।" কিন্তু কৌতূহলী, জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা তৃষ্ণার্ত মানব হৃদয় বিজ্ঞানের সহস্র যুক্তিকেও তুচ্ছ মনে করে যুগ যুগ ধরে অন্তরে অনুভব করে এসেছে যে 'স্থূলজয়ে সমর্থ সূক্ষ্মবস্তু তাহার অভ্যন্তরে দৃঢ়ভাবে বর্তমান... নিত্যমুক্তি ও নির্মল আনন্দলাভ করা ধর্মের উদ্দেশ্য।) এই যে ধর্মের উদ্দেশ্য, সেই বিজ্ঞানকল্পিত evolution এরও উদ্দেশ্যে।' তবে কেবল দর্শন নয় ভাষা, ব্যকরণ, সাহিত্য, স্থাপত্য, কলা, সঙ্গীত, ওষুধ, প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞানে ভারত যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। মুসলমান শাসনকালের দমনপীড়নও ভারতীয় মনীষাকে অবরুদ্ধ করে রাখতে পারেনি। তাই জিয়াউদ্দিন বরনি, শাম্‌স-ই-সিরাজ-আসিফ, আমির খসরু, মির্জা-জান-ই-জানান, তানসেনের পাশাপাশি কৃষ্ণদেব রায়, পোদ্দান, বেদের বিখ্যাত টীকাকার সায়ন, মহিলা কবি গঙ্গাদেবী ও তিরুমালাম্মা, বিজয় সেন, কাশীরাম দাস, উপেন্দ্র মতো সাহিত্যিকদের পাশাপাশি সুরদাস, হরিদাস স্বামী, রামদাসের মতো সঙ্গীতজ্ঞদের নামও ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাই যাঁরা ভারতীয় সাহিত্য, শিল্পকলার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে রেখে গেছেন উত্তর প্রজন্মের জন্য। এমনকী প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ পেরিয়ে আধুনিক যুগেও এই ধারা সমগতিতে প্রবহমান। আধুনিক ভারত আজ পাশ্চাত্যের কাছে 'সফটওয়ার হাব' নামে পরিচিত। পাশ্চাত্যে ভারতীয় মেধার কদর ক্রমশ বাড়ছে। সাদা বিপ্লব, সবুজ বিপ্লব, মঙ্গলায়ন, চন্দ্রপৃষ্ঠে জলের আবিষ্কার এসবই আধুনিক ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অন্যতম মহান কৃতিত্ব। জীববিজ্ঞানী, কৃষিবিজ্ঞানীদের প্রতিনিয়ত গবেষণা ও সহায়তা দুগ্ধ উৎপাদনে ভারতকে প্রথম স্থানে নিয়ে এসেছে। গম ও ধান উৎপাদনে দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎপাদক দেশে পরিণত করেছে। রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইটের ক্ষেত্রেও প্রথম স্থান অধিকার করেছে। কম দামের কম্পিউটার- সিমপিউটার তৈরির ক্ষেত্রে কিন্তু ভারতই পথিকৃৎ। বিশ্বব্যাপী বি-স্কুলগুলির বিভিন্ন পদ অলঙ্কৃত করে

রেখেছেন ভারতীয়রাই। ভেষজের স্বাভাবিক উৎসের আবিষ্কারের ধারণার তত্ত্ব কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইনড্রাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (সি এফ আই আর) গ্রহণ করেছে যা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে।

এতদ্‌সত্ত্বেও পাশ্চাত্যদেশীয় ও পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডারের গুণমুগ্ধ, বিদেশ থেকে আহৃত কমিউনিজম্-এর রসাসক্ত কিছু ভারতীয় বিদ্বজ্জনের কাছে ভারতীয় সংস্কৃতি স্থবির ও কল্পনার ভিত্তিপ্রস্তরের উপর নির্মিত। বিখ্যাত ঐতিহাসিক রোমিলা থাপারের মতে ভারতীয় সংস্কৃতি স্থবির, মোটের উপর নিষ্প্রাণ এবং জীবনচর্যার পক্ষে ক্ষতিকারক। যদিও এটি একটি অভিসন্ধিমূলক বিশ্লেষণ বর্ণ- বিন্যাসের সম্পর্কে। যে কৃষি ব্যবস্থা বা বিপুল বাণিজ্যিক উদ্যোগ শতাব্দী ব্যাপী দেখা গেছে তা কেবলমাত্র একটি অনড় আর্থ-সামাজিক কাঠামো। অপরদিকে পিউরিটান মিশনারি জন এলিয়ট মনে করতেন হিন্দুধর্ম মূলত শিক্ষা দেয় কিছু ভ্রান্তিপূর্ণ জীবনদর্শনের যা অদৃষ্টবাদ ও পুনর্জন্মকে উৎসাহিত করে। এরা মনে করেন ভারতীয় অদৃষ্টবাদ স্বীকার করে যে ব্যক্তির তার জীবনের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। সব কিছুই ঈশ্বরের দ্বারা পূর্বনির্ধারিত। এক্ষেত্রে পাশ্চাত্যবিদগণের দ্বারা গীতার যে শ্লোকটির বিভ্রান্তিকর অনুধাবন হয়েছে তা হলো—

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফল হেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্মণি।। (২/৪৭)

গীতার উক্ত শ্লোকটি নিষ্কাম কর্ম করার উপদেশ দেয় অথচ পশ্চিমের জড়ত্ববাদীদের কাছে এই নিষ্কাম কর্ম প্রতিভাত হয়েছে উচ্চাশা ব্যতিরেকে কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে। প্রতীচ্য জড়বাদীদের দৃষ্টিতে ইহলোকে ভোগ বা জয়লাভই হলো প্রধান বিষয়। নিষ্কাম কর্মের প্রকৃত অর্থ এদের কাছে অজ্ঞাত।

ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে অদৃষ্টবাদের এই যে প্রচলিত মেলবন্ধন তার বিশ্লেষণ করতে হলে আমাদের কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে যেতে হবে। ইসলামিক আগ্রাসনের প্রারম্ভে বর্বর আরব বেদুইনদের সীমাহীন অজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাহীন উদ্ধত মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছিল তাদের ধ্বংসাত্মক কাজের মধ্য দিয়ে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন মন্দিরে যে সকল পুঁথি সংরক্ষিত ছিল তা ভস্মীভূত করে দেওয়া হয়েছিল। সনাতন ধর্মের উপর করা হয়েছিল কঠোর কুঠারাঘাত। তৎকালীন সমাজে বিদ্যার ধারক ও বাহকদের (এদের মধ্যে পুরোহিত সম্প্রদায়ও ছিলেন) উপর নেমে এসেছিল ধর্মান্তর, অত্যাচার বা মৃত্যুর ধারালো খাঁড়া। তারপর অত্যাচারের পর যা কিছু অবশিষ্ট রইল, তা ভক্তি আন্দোলন, সুফি আন্দোলনের স্রোতে পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত হয়ে গেল। পরবর্তীকালে বৃটিশ ঔপনিবেশিকতার যুগে ভারতীয় সংস্কৃতি, অর্থনীতির উপর পুনরায় যে ক্ষতের সৃষ্টি হলো, তাতে এখনও পর্যন্ত যথার্থ প্রলেপ লাগানো সম্ভব হয়নি। ভারতীয় সম্পদ শোষণ করে বৃটেনে যে শিল্প বৈভব গড়ে উঠেছিল তা ভারতীয় অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিয়েছিল। ফলত ক্ষুধা নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পেশার মধ্যে এক বড়সড় অদলবদল ঘটে। বাপ ঠাকুরর্দার পেশা ছেড়ে অনেকেই শহরে গমন করে। এই পরিযায়ী ব্যক্তিবর্গের তালিকায় গ্রামের সম্পন্ন জমিদার, পণ্ডিত থেকে শুরু করে প্রান্তিক মানুষেরাও ছিল। অপরদিকে বৃটিশ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ও ভারতীয় পুঁথি পুনরুদ্ধার করে তাঁদের মনোমত অনুবাদ ও রচনা করতে থাকেন। ঐশ্বর্যশালী প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে বিস্মৃতির অন্তরালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে তাদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের মধ্যরাতের ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করলেও মানসিকভাবে ঔপনিবেশিকতার দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে পারেনি। কয়েকশো বছরের ভারতীয় অর্থনীতির পঙ্গুত্ব দারিদ্র্য, তৃণমূল স্তরের বৌদ্ধিক শূন্যতা এবং ধর্মশাস্ত্র পড়ার প্রতি অনীহা অথবা ইংরেজি ভাষাকে জ্ঞানের মূর্ত প্রতীক স্বরূপ গ্রহণ করে পাশ্চাত্যের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুশাস্ত্রের অধ্যয়ন করার কুফলেই বর্তমান ভারতীয় ভাবনার সঙ্গে অদৃষ্টবাদ সম্পৃক্ত হয়েছে।

অথচ প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে কর্মের উপর গুরুত্বের সঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। আমাদের শাস্ত্র আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তিতে বিশ্বাস করে। মানুষ যেমন পুরনো বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, তেমনই আত্মাও জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর গ্রহণ করে। এর সঙ্গে সঙ্গে তার কর্মপ্রসূত ফল— তা ভালো হোক বা খারাপ, তাও তাকে ভোগ করতে হয় পূর্বজন্মে হোক বা পরজন্মে। তবে এই সঞ্চিত কর্মও খণ্ডনের বিধান বেদান্তে রয়েছে। যে আত্মজ্ঞানী পুরুষ পরম ব্রহ্মকে আত্মা-অনাত্মা-বিবেকের দ্বারা উপলব্ধি করবেন, তিনিই পূর্ব এবং পরজন্মের সঞ্চিত ফলের কারণে মুক্তিলাভ করবেন। এই প্রকার আত্মজ্ঞানী বা সত্যদ্রষ্টা পুরুষ সমস্ত জড় ও জীবের মধ্যে পরম ব্রহ্মকে দর্শন করে লোক সংগ্রহ অর্থাৎ সাধারণের কল্যাণের নিমিত্তে কর্ম করে। তাঁর কাছে সমস্ত কর্মই পরমাত্মার বেদীতে নিবেদিত কর্ম। আর এখানেই 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' ধারণার যথার্থ প্রয়োগ ঘটে। কর্মযোগ মানুষকে আরোও উদ্দীপনার সঙ্গে, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করতে উৎসাহিত করে। ফলের আকাঙ্ক্ষা মানুষের মধ্যে অস্থিরতা, ক্রোধ, হতাশার সৃষ্টি করে। তাই শাস্ত্রমতে কর্ম কেবল কাজ করা বোঝায় না, বরং কর্মের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি ঘটিয়ে জ্ঞানের পথে চালিত করে মোক্ষলাভে সহায়তা করে।

অন্য রকম

গুগল গুরুদেব ইমরান

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ লক্ষ্য একটাই। শিক্ষা পৌঁছে দিতে হবে ঘরে ঘরে। যে শিক্ষার আলোয় শিক্ষিত হয়ে সমাজ গড়ার কাজ করবে আগামী প্রজন্ম। এই চিন্তাধারা নিয়েই এগিয়েছিলেন এক শিক্ষক। যে স্বপ্ন নিয়ে তিনি এগিয়েছিলেন তা সফল করতে পেরেছেন বেশ অনেকটাই। তিনি ইমরান। পেশায় শিক্ষক ইমরান খানের নাম এখন দেশ-বিদেশের সকলের মুখে মুখে। সকলের কাছে এই নাম পৌঁছে দিয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। ইমরানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে দেখা গেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। সম্প্রতি ইউ কে সফরে গিয়ে বৃটিনের সর্ববৃহৎ উইম্বলে অডিটোরিয়ামে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ইমরানের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন নরেন্দ্র মোদী।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'আমার ভারতে ইমরান খানের মতো লোক বসবাস করেন।' এখন প্রশ্ন উঠতে পারে হঠাৎ ইমরানের কথা কেন বললেন প্রধানমন্ত্রী? বিদেশ সফরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী যখন বক্তব্য রাখেন তখন ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি, বাণিজ্যিক সমস্ত দিকই তুলে ধরেন। সেরকম বৃটেনের এই বৃহৎ অডিটোরিয়ামে তিনি যখন ডিজিটাল ইন্ডিয়ার কথা তুলে ধরেন তখনও ইমরানের প্রসঙ্গ উঠে আসে। কারণ ইমরান শিক্ষা সংক্রান্ত প্রায় ৫২টি অ্যানড্রয়েড অ্যাপস তৈরি করেছেন। দেশের যে সমস্ত জায়গায় শিক্ষার পরিবেশ গড়ে ওঠেনি সেখানে শিক্ষার বাতাবরণ তৈরিতে সাহায্য করবে তাঁর তৈরি অ্যাপস। আর এই অ্যাপস ডিজিটাল ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত। অতীব গ্রাম্য পরিবেশে শৌচালয় ও জলের সমস্যা। সর্বোপরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব থাকলেও অ্যানড্রয়েড মোবাইলের অভাব নেই। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় জানা গেছে, ভারতের ১২৫ কোটি মানুষের মধ্যে ১০২ কোটি মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। আর এটাকেই কাজে লাগিয়েছেন ইমরান।

রাজস্থানের আলওয়ার জেলার লক্ষ্মীনগরে বাস ইমরান খানের। সরকারি মাধ্যমিক সংস্কৃত স্কুলের শিক্ষক ইমরান খান। স্কুলে চাকরির পাশাপাশি তিনি চেয়েছিলেন সারা দেশকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে। সেই মতো তিনি কাজে হাত লাগান। গণিতের শিক্ষক ইমরান কম্পিউটার শিক্ষায় ততটা সড়গড় নন। কিন্তু তা সত্ত্বেও পিছিয়ে যাননি। ভাই ইদ্রিশ খান আলওয়ারের ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে বি.টেক করেছেন। বর্তমানে তিনি গুরগাঁওয়ের এক সফটওয়ার কোম্পানিতে কর্মরত। তাই ইমরান ভাই ইদ্রিশের বই নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। মোবাইল অ্যাপস কীভাবে তৈরি করতে হয় বা আরও কীভাবে উন্নত করা সম্ভব সেসব বিষয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। কম্পিউটার সংক্রান্ত বই মাত্র ছ' মাস পড়ার পরই তিনি মনস্থির করেন স্মার্ট ফোনের অ্যাপস তৈরি করবেন। ২০১২ সালে তিনি প্রথম তৈরি করেন মোবাইল অ্যাপস। কিন্তু তখনও তাঁর হাতে এসে পৌঁছয়নি কোনো অত্যাধুনিক স্মার্ট ফোন। তাঁর তৈরি ৫২টি অ্যাপসের মধ্যে অন্যতম www.gktalks.com এবং এই www.gyanmajari.com. এই জিকে টকস্ (gk talks) ওয়েবসাইট থেকে সাধারণ জ্ঞান সংক্রান্ত অনেক প্রশ্নোত্তর পাওয়া যায়। বর্তমানে ইমরানকে অনেকেই 'গুগল গুরুদেব' বা 'মিঃ অ্যানড্রয়েড' বলেও ডেকে থাকেন। ইমরানের তৈরি অ্যাপস আজ মানুষের হাতে হাতে এসে পৌঁছেছে। প্রত্যন্ত এলাকার মানুষকে অনেক সাহায্য করছে বলেও সরকারি সূত্রে জানা যায়। বর্তমানে ভারত তথা বিশ্বের ৩০ লক্ষ মানুষ তাঁর তৈরি অ্যাপস ডাউনলোড করে ব্যবহার করছে এবং ১ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষ সেই অ্যাপস অনলাইনে দেখছে। এটা কম পাওনা নয় ৩৭ বছরের ইমরানের কাছে। তবে ইমরানের বড় পাওনা বিদেশের মাটিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখে নিজের প্রশংসা। এ প্রসঙ্গে ইমরান বলেন, 'আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না যে মোদী সাহেব তাঁর বক্তব্যের মধ্যে আমার নাম উল্লেখ করেছেন। যেখানে আমি একজন সাধারণ গণিতের শিক্ষক, শুধু অঙ্কই ভালোবাসি। আর ওঁর মুখে আমার নাম শুনে আমি আনন্দিত।' কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের আমন্ত্রণে ২০১৪-র সেপ্টেম্বরে মুসৌরির লালবাহাদুর শাস্ত্রী ন্যাশনাল অ্যাকাডেমির একটি সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন। সেখানে দর্শকের আসনে ছিলেন শিক্ষানবীশ আই এ এস আধিকারিকগণ। এছাড়াও কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ ইমরানকে ফোন করে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। তাঁকে বিএসএনএল ইন্টারনেট পরিষেবা বিনামূল্যে দেওয়া হবে বলেও জানান। আর নভেম্বরে বিজ্ঞান ভবনে হওয়া মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের এক সেমিনারে জানানো হয় তাঁর তৈরি অ্যাপস 'এন সি ই আর টি সায়েন্স' (নবম শ্রেণীর জন্য) এবং সাধারণ জ্ঞান পাঠক্রমের মধ্যে আনা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপ সত্যিই এক উল্লেখযোগ্য। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

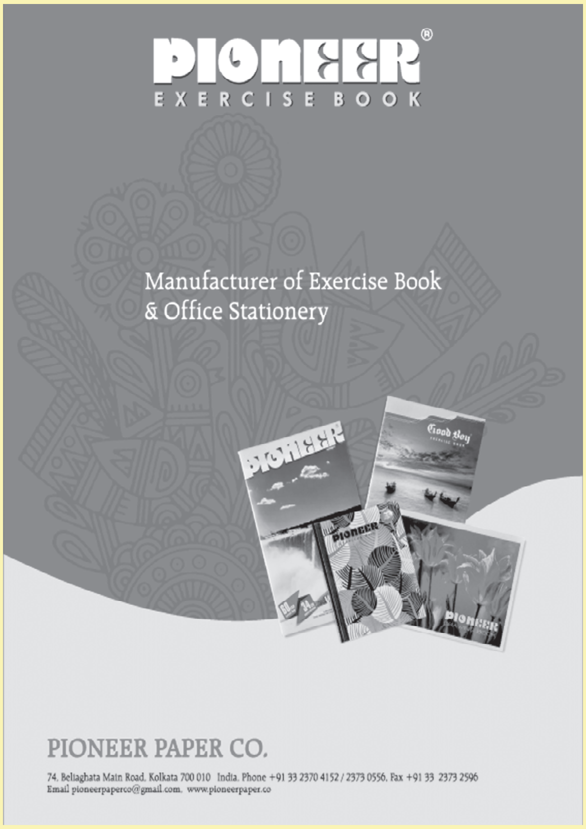

‘মানবিকতা বলতে মন বা আত্মাকে বুঝায়, দেহ বা রক্তমাংসকে নয়। চিন্তা বা অনুভূতিই এর উত্তরাধিকার। উচ্চ চিন্তার দ্বার শিক্ষার্থীর কাছে রুদ্ধ করে রাখা হত্যাকার্য অপেক্ষা এক গুরুতর অপরাধ। কারণ, তার ফলে বন্ধন-সৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক বিনাশ, তার পরিণাম মহতী বিনষ্টি।’

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

আয়ুর্বেদের পঞ্চকর্ম থেরাপি

সঞ্জীব বিশ্বাস

ভারতবর্ষ মুনিঋষির দেশ। মুনিঋষিরা দীর্ঘ ও নীরোগ জীবনযাপনের জন্য গাছের পাতা, শেকড়, ছাল, মূল ইত্যাদি রোগমুক্তির উপায় হিসাবে বেছে নিতেন। অর্থাৎ রোগ মুক্তির জন্য প্রাচীন আয়ুর্বেদের উপরই তারা নির্ভর করতেন। সেই আয়ুর্বেদের অন্যতম একটি পদ্ধতি হচ্ছে পঞ্চকর্ম। পঞ্চ অর্থাৎ পাঁচ এবং কর্ম হচ্ছে কৃতকর্ম বা কাজ। চিকিৎসাশাস্ত্রে সেই পঞ্চকর্ম আজকের এই প্রযুক্তির যুগেও সমান ভাবে কার্যকরী। বরং দিন দিনই পঞ্চকর্ম বিপুল জনপ্রিয় হয়ে উঠছে সাধারণ্যে। পঞ্চকর্মের কথা শুনলে প্রথমেই আমাদের দেশের কেরল রাজ্যের কথা মনে পড়ে। প্রতি বছর দেশ বিদেশের লক্ষ লক্ষ লোক কেরলে গিয়ে আয়ুর্বেদের প্রাচীন এই থেরাপির মাধ্যমে রোগমুক্তির উপায় পেতে হামলে পড়েন। কেরলের আয়ুর্বেদ ইতোমধ্যেই সারা বিশ্বে বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় চিকিৎসা পদ্ধতি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। পঞ্চকর্ম চিকিৎসা পদ্ধতি ভারতে ধীরে ধীরে আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ছোট পরিসরে হলেও ত্রিপুরায় গত চার বছর ধরে পঞ্চকর্ম থেরাপির মাধ্যমে আয়ুর্বেদের প্রাচীন এই ধারাটি প্রয়োগ করে মানুষজনের রোগমুক্তির উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। রাজ্য সরকারের বন দপ্তরের মেডিসিন্যাল প্ল্যান্টস্ বোর্ডের অধীনে ত্রিপুরায়ও পঞ্চকর্ম থেরাপির দু'টি ইউনিট বর্তমানে চালু আছে। এর একটি হচ্ছে রাজধানীর অদূরে গান্ধীগ্রামের কাছে হাতিপাড়ায় এবং অপরটি হচ্ছে সিপাহীজলা অভয়ারণ্যে।

■ **পঞ্চকর্ম থেরাপি কি?**

আগেই বলা হয়েছে 'পঞ্চ' মানে পাঁচ আর কর্ম মানে অ্যাকশন। আয়ুর্বেদের এটি হচ্ছে পিউরিফিকেশন থেরাপি বা শোধন প্রক্রিয়া। এর লক্ষ্যই হচ্ছে শরীরের বিভিন্ন দোষ কাটিয়ে তোলা। শরীরের এই দোষগুলি হচ্ছে বাত, পিত্ত, কফ ইত্যাদি। পঞ্চকর্মের পাঁচটি থেরাপি হচ্ছে বমন (এসেটিক থেরাপি), বিরেচন (পারগেশন থেরাপি), বস্তি (মেটিকেটেড এনেমা থেরাপি), নস্য (এরহাইন থেরাপি) এবং রক্ত মোক্ষণ (ব্লাড লেটিং)।

■ **কারা এই থেরাপি নিতে পারবেন?**

দুই থেকে আশি বছরের যে কোনো ব্যক্তি এই থেরাপি নিতে পারবেন। তবে তা শরীরের অবস্থার উপর অবশ্যই নির্ভর করে।

■ **পঞ্চকর্মের উপকারিতা।**

শরীর থেকে সমস্ত দূষিত পদার্থ বের হয়ে যাবার ফলে দেহ ও মন সতেজ হয়।

■ দেহে শারীরিক ভারসাম্য ফিরে আসে এবং শরীর চাঙ্গা হয়।

■ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে।

■ শরীর এবং মন থেকে নেতিবাচক চিন্তা দূর হয়, মন ইতিবাচক হয়, যৌবন প্রলম্বিত হয়।

■ আত্মনির্ভরতা বাড়ায়, আস্থা বাড়ে, স্নায়ুর কাজ বাড়ে, ইন্দ্রিয়গুলি আরও সতেজ হয়।

■ **কোন্ কোন্ রোগের ক্ষেত্রে পঞ্চকর্ম দারুণ উপকারে আসে?**

বাত, পক্ষাঘাত বা প্যারালাইসিস, জয়েন্ট পেইন, স্পন্ডেলাইটিস, কিডনির সমস্যা, মানসিক সমস্যা ইত্যাদি।

■ **বিধি :**

(১) সর্বাঙ্গ অভঙ্গ। এটি হচ্ছে মূলত শরীর ম্যাসাজ করা তেলের মাধ্যমে। প্যারালাইসিস, ডায়েবেটিস, জয়েন্ট পেন, বাতের রোগীদের জন্য এই থেরাপি বেশ ফলপ্রসূ। সময়কাল পঞ্চান্ন মিনিট।

(২) সর্বাঙ্গ বাষ্প সাধনা। এটির অবশ্য বর্তমানে কোনো মূল্য লাগছে না। এই থেরাপিটি হচ্ছে তেল দিয়ে ম্যাসাজের পর একটি ভ্যাপার বাক্সে রোগীকে রাখা হয় ২৫-৪৫ মিনিট। এতে শরীরের সমস্ত দূষিত পদার্থ ঘামের মাধ্যমে শরীর থেকে নির্গত হয়। ফলে দেহ মনে সতেজতা আসে।

(৩) শিরধারা। এই থেরপির মাধ্যমে কপালে এক বিশেষ ধরনের তেল বা বাটারমিল্ক ঢালা হয়। প্রাত্যহিক জীবনে মানসিক চাপ থেকে মুক্তি দেয় এই থেরাপি। সময়কাল-দেড় ঘণ্টা।

তৎক্ষণাৎ ব্যথা কমানোর জন্য এই থেরাপি প্রদান করা হয়। বিশেষ করে কোমর, হাঁটু ইত্যাদির ব্যাথার হাত থেকে এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করালে তৎক্ষণাৎ মুক্তি পাওয়া যায়। সময়কাল— দেড় ঘণ্টা।

(৪) উদ্বর্তানাম— এর মাধ্যমে পুরো শরীরকে ভেষজ ডাস্টের মাধ্যমে ম্যাসাজ করা হয়। এর ফলে ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, স্থূলত্ব এগুলির রোগমুক্তি ঘটে। সময়কাল দুই ঘণ্টা।

(৫) নস্য— এর মাধ্যমে নাকে এক বিশেষ ধরনের মেডিসিন ব্যবহার করা হয় এবং শোধন করা হয়। তাতে করে নাক, কান, গলা, মাথার বিভিন্ন রোগের মুক্তি লাভ ঘটে। সময়কাল দেড় ঘণ্টা।

(সৌজন্যে দৈনিক সংবাদ)

পুরুষের শুভাশুভ বৈশিষ্ট্য

অশোক কুমার মণ্ডল

চলমান জীবন প্রবাহে তথা বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় ভারত-সহ সমগ্র বিশ্ব অস্থিরতা, অশান্তি, দ্বন্দ্ব ও জটিলতায় ভারাক্রান্ত। জীবন যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে সুস্থভাবে বাঁচার আশায় মানবের মন সতত বিচলিত। যা করায়ত্ত হয়নি তা লাভ করার আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। উন্নত চিন্তা, লক্ষ্যে অবিচল, নিরলস প্রচেষ্টা, শিক্ষা-সহ কলাকুশলীগত যোগ্যতায় সার্থক জীবনের সন্ধান সকলেই পেতে চায়। জানতে চায় না পাওয়াকে অতিক্রম করে পাওয়ার অদম্য উৎসাহের বাস্তব রূপায়ণ কবে হবে? বিদগ্ধ জনের বিশ্বরূপ দর্শন বা কোনো জ্যোতিষতীর্থের পুণ্য সঞ্চয়ে আশাহত না হয়ে পুরুষ ও নারীর শুভাশুভ লক্ষণ দেখে নিজেই নিজেকে জানার মনোবাঞ্ছা পূরণে সময়োপযোগী নিবেদন।

পুরুষের শুভাশুভ লক্ষণ :

১। সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, কালো কোঁকড়ানো চুল, প্রশস্ত ললাট, ললাটে শিবরেখা/বিষ্ণুরেখা, মধ্যললাটে বা ডান প্রান্তে কালো তিল, টিকালো নাক, কালো চোখের তারা, সাদা ধবধবে ছোট দাঁত, চাঁপা কুঁড়ির ন্যায় স্নিগ্ধ অধর, গলায় একাধিক বলি, সূক্ষ্ম গোলাপি নখ, উন্নত বক্ষ, প্রতি লোমকূপে ১/২ টি করে গোলাকৃতি লোম, মাংসল মুখমণ্ডল, ছোট মুখ (গাল), সমতল পদদ্বয়, ঘন সন্নিবদ্ধ হাত ও পায়ের আঙুল, আঙুলের পর্বে একটি করে রেখা, পায়ের আঙুলে গুচ্ছ লোম, দীর্ঘ নয়নযুগল ও ভ্রূদ্বয়, করতল নেত্রের প্রান্তভাগ, অধর ও জিহ্বা রক্তবর্ণ, স্বল্প রেখা (৩/৪) বিশিষ্ট করতল।

(ক) **প্রথম শ্রেণীর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর :** লোকপ্রিয়-প্রতিষ্ঠা-চিন্তার বাস্তব রূপায়ণ। উদাহরণ— রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জী, আন্না হাজারে, কয়েকজন রাজনীতিক, খেলোয়াড় এবং সমস্ত দূরদর্শনের সংবাদ পাঠক-পাঠিকা ও সঞ্চালক।

(খ) **মধ্যম শ্রেণীর কণ্ঠস্বর :** যোগ্য কর্মে দক্ষ, জনপ্রিয়, পূর্ণ স্বাধীনতা স্পষ্ট। উদাহরণ— কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী সুষমা

স্বরাজ, কয়েকজন কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরের রাজনীতিক।

(গ) **ফ্যাসফেঁসে :** কণ্ঠস্বর— অন্যান্য শুভ বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও জীবনের তিনটি পর্যায় (উত্থান— চরম উত্থান— অবনমন) উদাহরণ— লালকৃষ্ণ আদবানী, রাম জেঠমালানী, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, কিরণ বেদি এবং এ রাজ্যের কয়েকজন নেতা-নেত্রী।

২। প্রথম শ্রেণীর শিবরেখা— (ললাটের পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত)— সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। মধ্যম শ্রেণীর শিবরেখা (কাটা কাটা বা ছোট ছোট) দলাই লামা, অশোক সিংহল, অমর্ত্য সেন, অনুপম খের, অরুণ শৌরী, যশবন্ত সিন্‌হা, শাহরুখ খান।

শিবরেখার পরেই বিষ্ণু রেখার গুরুত্ব (নাকের উভয়পার্শ্বে লম্ব রেখাদ্বয়)। উদাহরণ— বেশ কয়েকজন কেন্দ্র ও রাজ্যের নেতা।

৩। উত্তম শ্রেণীর প্রশস্ত ললাট— প্রত্যয়ী-আদর্শবাদী, আপোশহীন, কালজয়ী। উদাহরণ— নেতাজী, শ্যামাপ্রসাদ, আম্বেদকর, প্রবীণ তোগাড়িয়া।

মধ্যম শ্রেণীর— মনমোহন সিং, নরেন্দ্র মোদী, অশোক ঘোষ, ভিক্টর ব্যানার্জী, সুব্রানিয়াম স্বামী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গাভাস্কার।

সুগোল মুখমণ্ডল, ছোট মুখ ও দন্তাবলি, মিষ্ট স্বর, সুদৃশ্য হস্ত ও পদদ্বয়— অধ্যবসায়, সদর্থক চিন্তা, আশাতীত সাফল্য ও সম্মান। এছাড়াও কয়েকটি লক্ষণ :

* জিহ্বা, করতালু, অধর, নয়নপ্রান্ত রক্তিম, পদতল পদ্মোদল সদৃশ— বিদ্বান, ধনবান, কীর্তিমান।

* দীপ্তিময় চোখ, বাহুদ্বয় বিশাল-ললাট ও উন্নত বক্ষ— জ্ঞানী, তেজস্বী, নির্ভীক, আদর্শনিষ্ঠ, উদার।

* প্রতি লোমকূপে ও গলায় দু'টি করে লোম ও বলি, আঙুলে একাধিক চক্র, স্নিগ্ধ গোলাপি নখ— ম্যানেজার, ডিরেক্টর অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের প্রধান।

* মুখমণ্ডলের চিকনতা, ললাটের মধ্যভাগে কালো তিল, কুঞ্চিত কেশ— উন্নত হৃদয়, গরিব হলেও বিদ্বান, ধনবান, যশ ও প্রতিষ্ঠা।

* ললাটের বাম পার্শ্বে তিল, আঙুলের পর্বে একাধিক রেখা, কৃষ্ণবর্ণ নখ ও দন্তমাড়ি, বিস্তার বহুল পদাঙ্গুলি— কায়িক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা, মান-সম্মানের ক্ষেত্র ও জমার ভাণ্ডার অশুভ।

* রুক্ষ্ম করতল, ছুঁচোলো মুখ, বিকট চক্ষুদ্বয়, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ গদার ন্যায় মোটা— রক্ষণশীল, নেতিবাচক চিন্তা ও কর্ম।

(লেখক স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক)

‘শ্রদ্ধা’র শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ১৫ নভেম্বর সহস্রাধিক পূর্ণচন্দ্র দর্শনধন্যা ৮৩ বৎসর বয়স্কা সিউড়ী চাঁদনীপাড়া নিবাসী শ্রীমত্যা অলোকা সেনকে ‘শ্রদ্ধা’র বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান অনুষ্ঠান তাঁরই ভদ্রাসনে সকাল ৯টায় অনুষ্ঠিত হয়।

মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সূচনা তিনবার ‘ওঁ’ ধ্বনি দিয়ে ও মঙ্গলদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে করা হয়। মঙ্গলদীপ প্রজ্বলন করেন সিউড়ী প্রবীণ স্বয়ংসেবক ও বিশিষ্ট বাস্তুশাস্ত্রবিদ দিলীপ কুমার ঘোষ। একমাত্র কন্যা শ্রীমতী বনানী দাস তাঁর মাকে পা-হাত ধুইয়ে পূজা করেন। শ্রদ্ধার পক্ষ থেকে মাল্যদান করেন শ্রদ্ধার অনুদানী শ্রীমতী নীলিমা দত্ত। গীতা, বস্ত্র, নামাবলী, ফল, মিষ্টান্ন অর্ঘ্যস্বরূপ প্রদান করা হয়। শ্রদ্ধার অনুদানী তথা গোপাল-সেবিকা শ্রীমতী বনানী চৌধুরী অনুষ্ঠানে একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। শ্রদ্ধার পক্ষে বক্তব্য রাখেন সিউড়ী শাখার স্বয়ংসেবক তথা মায়ের বড়পুত্র চঞ্চল সেন। সেন পরিবারের সকলে, প্রতিবেশী ও শ্রদ্ধার অনুদানী নিয়ে প্রায় ৪০ জনের মতো অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শিক্ষক সুব্রত সিনহা। পরিশেষে পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সিউড়ী বেণীমাধব উচ্চ বিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিক্ষক পতিতপাবন বৈরাগ্য।

Swachchha Bharat   Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

+ Low Cost readymade Latrine (Toilet) + Low Cost House
+ Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
+ Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71,
Park Street, Kolkata - 700 016
M : 98311 85740, 98312 72657,
Visit Our Website : www.calcuttawaterproofing.com

সমাবেশ সমাচার

পরলোকে সতীশচন্দ্র বর্মন

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কোচবিহার বিভাগ সঙ্ঘচালক সতীশচন্দ্র বর্মন আর নেই। গত ২৫ নভেম্বর ভোরে মুম্বইয়ের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৫৫ সালের ১৫ এপ্রিল তাঁর জন্ম। বিদ্যা ভারতী উত্তরবঙ্গের সদস্য ও সারদা শিশুতীর্থ মাথাভাঙ্গার সম্পাদক হিসেবেও তিনি সক্রিয়

ছিলেন। ১৯৭৬ সালে জরুরি অবস্থার সময় সত্যাগ্রহ করে তিনি কারাবরণ করেন। আবাল্য স্বয়ংসেবক শ্রী বর্মন গত ৩০ এপ্রিল ২০১৫, রাজ্য শিক্ষা দপ্তর থেকে অবসর গ্রহণের পর আরও বেশি সময় দিয়ে সঙ্ঘের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। গত ১৬ নভেম্বর অসুস্থবোধ করাতে কোচবিহারের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি হওয়ার দু’দিন পর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে মুম্বইয়ে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই চিকিৎসকদের সবচেষ্টা ব্যর্থ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দুই পুত্র ও স্ত্রী মৃত্যুর সময় পাশেই ছিলেন। ২৬ নভেম্বর মাথাভাঙ্গা মহাশশ্মানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

কলিগ্রামে অশোক সিংহলজীর স্মরণসভা

২৯ নভেম্বর, ২০১৫ রবিবার মালদহে কলিগ্রাম সরস্বতী শিশু মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সংরক্ষক প্রয়াত অশোক সিংহলজীর স্মরণসভা। তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। স্মরণসভায় গীতা পাঠ করেন উত্তম দাস এবং প্রয়াত নেতার জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করেন ডাঃ দেবাশিস রায়চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ দাস, সুভাষকৃষ্ণ গোস্বামী, অশেষকৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ। পরিশেষে শান্তিমন্ত্র পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

মঙ্গলনিধি

বাঁকুড়া নগরের স্বয়ংসেবক জিতেন্দ্রনাথ মণ্ডল তাঁর একমাত্র পুত্র রানাপ্রতাপের শুভ বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন জেলা সঙ্ঘচালক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক বিদ্যুৎ দত্ত, প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের রাজ্য সভাপতি অবনী ভূষণ মণ্ডল, জেলা সম্পর্ক প্রমুখ ডাঃ তাপস বিশ্বাস, বাঁকুড়া জেলা প্রচারক সৃজন কুমার হাজরা প্রমুখ।

শোকসংবাদ

গত ২৬ নভেম্বর রাতে মাথাভাঙ্গা মহকুমার ডাকঘরার স্বয়ংসেবক যোগেশ বর্মনের মাতৃদেবী পূর্ণবালা বর্মন ৭৯ বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, ৪ পুত্র ও ২ কন্যা রেখে গেছেন।

***

বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া খণ্ডের শারীরিক প্রমুখ অভিজিৎ মাজীর পিতৃদেব মন্মথ মাজী গত ৪ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে দুই পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

দিল্লিতে অশোক সিংহলজীর স্মরণসভায় বক্তব্য রাখছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক তথা বিশ্বহিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি বালকৃষ্ণ নাইক।

অবিস্মরণীয় ‘নটসূর্য’

রূপশ্রী দত্ত

‘নটসূর্য’ অহীন্দ্র চৌধুরী রঙ্গমঞ্চ ও চিত্রজগতের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তিনি শুধু অভিনেতা ছিলেন না, নির্দেশকের দায়িত্বও দীর্ঘ অভিনয়জীবনে পালন করেছেন একাধিকবার।

অহীন্দ্র চৌধুরী ১৮৯৬ সালের ৬ আগস্ট জন্মেছিলেন কলকাতার চক্রবেড়িয়াতে। অধ্যয়ন করেছিলেন ‘শিশু বিদ্যালয়’ ও ‘লন্ডন মিশনারী’তে। ১৯১১ সালে তাঁর পাঠ্যজীবন শেষ হয়েছিল।

পরবর্তীকালে তিনি অভিনয়জীবনে প্রবেশ করেছিলেন। নির্বাক ছবি ‘ঋষির প্রেম’ (১৯৩১)-এ তিনি অভিনয় করেছিলেন। তার আগে সম্ভবত ‘Soul of a Slave’-এ তাঁকে দেখা গিয়েছিল। মঞ্চের কিংবদন্তী ব্যক্তিত্ব হলেও তিনি অভিনয় করেছিলেন কিছু ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও সামাজিক ছবিতে। যেমন, ‘দুর্গেশনন্দিনী’, ‘কৃষ্ণসুদামা’, ‘রজনী’, ‘বিদ্যাসাগর’ ও ‘চিরকুমার সভা’।

১৯৫৭ সালে ‘শাজাহান’ নাটক মিনার্ভায় ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। ‘রঙমহল’ মঞ্চগৃহে তাঁর অভিনীত ‘কর্ণার্জুন’ চলেছিল ২৬০ রাত্রি। তিনি ‘ডীন অফ থিয়েটার’ নামক সম্মানজনক উপাধি লাভ করেন। ‘নটসূর্য’ উপাধি জনগণের আবেগাপ্লুত অন্তরেরও যথার্থ স্বীকৃতি।

নটসূর্যের দীর্ঘদেহ, এক বিরল বাচনভঙ্গী, চরিত্রের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে তাকে সজীব করে তোলা— উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যে তাঁকে সমৃদ্ধ করেছে। শ্রোতাদের সম্মিলিত, সহর্ষ করতালিতে মঞ্চ কেঁপে উঠত তাঁর প্রতিটি সংলাপে। বস্তুত, মঞ্চে তাঁর প্রবেশমাত্রই দর্শক যেন সঞ্জীবিত হয়ে উঠতেন এবং মূলত তাঁরই জন্য তাঁরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো একনিষ্ঠ হয়ে অভিনয় দেখে যেতেন।

অহীন্দ্র চৌধুরী মঞ্চে এসেছেন পরিণত বয়সের ব্যক্তিত্ব নিয়ে। মঞ্চে তিনি প্রৌঢ়, বৃদ্ধের চরিত্রই অভিনয় করেছেন। রোম্যান্টিক নায়ক হিসেবে তাঁকে দর্শক কোনোদিনই মঞ্চে পাননি। তা সত্ত্বেও সংবেদনশীল কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্রে তিনি আদিগুরু এবং অদ্বিতীয়— এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

১৯৫৮ সালে তিনি সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার পান। ১৯৬৩ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সাম্মানিক ডি লিট দেয় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে গেস্ট লেকচারার হিসেবে মর্যাদা দেয়।

১৯৭৪-এ নভেম্বরের ৪ তারিখে এই কিংবদন্তী ‘নটসূর্য আীহন্দ্র চৌধুরী’ লোকান্তরিত হন। ■

শব্দরূপ-৭৬৯ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

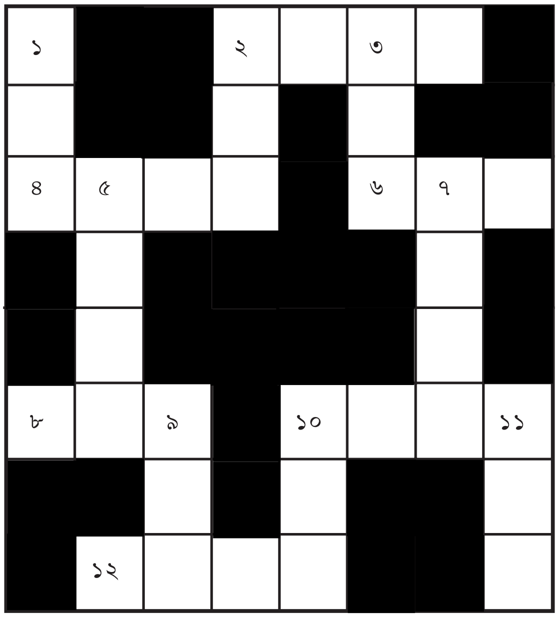

সূত্র :

পাশাপাশি : **২.** কাঁসর ঘণ্টার বোল, **৪.** পদ্ম, **৬.** স্কন্ধকাটা, মাথাকাটা ভূতবিশেষ, **৮.** ধনীদের ভ্রমণবিলাসের সুসজ্জিত নৌকা, **১০.** কলেরা, ওলাওঠা রোগ, **১২.** জীবজন্তুদের খাদ্যাদি দান।

উপর-নীচ : **১.** মহাধনী, কুবের, **২.** কোমর, কটি, **৩.** অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ছোটদের বই, **৫.** লতাজাত ফলবিশেষ, **৭.** বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম, **৯.** জমিদারের প্রজা, **১০.** বিদ্যুৎ, **১১.** নাগবিশেষ, কৃষ্ণ যাকে দমন করেছিলেন।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৬৬

■	■	■	■	■	ব	ড়	ই
■	ভা	র	বি	■	ণি	■	য়
প্র	■	■	ট	নি	ক	■	ং
জ্ঞা	ন	পা	পী	■	■	■	বে
পা	■	■	■	বী	চি	ভ	ঙ্গ
র	■	অ	ম্বু	জ	■	■	ল
মি	■	ন্ত্য	■	ন	হু	ষ	■
তা	বি	জ	■	■	■	■	■

সঠিক উত্তরদাতা

সুশীল কয়াল
কলকাতা-৬
কেদার কুম্ভকার
শালতোড়া, বাঁকুড়া

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

- ৭৬৯ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৮ ডিসেম্বর ২০১৫ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা ।। বিক্রমাদিত্য ।। ৯

বিদেশে কদর বাড়ছে ভারতীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সত্য নাদিলা, সুন্দর পিচাই, ইন্দ্র নোয়িদের নাম আজ সকলেই জানেন। ভারতে তাঁদের বেড়ে ওঠা এবং শিক্ষালাভ। কিন্তু কর্মসূত্রে এঁরা প্রত্যেকেই বিদেশের মাটিতে পা রেখেছেন। শুধু এঁরা নন, এঁদের মতো শত শত ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিদেশে রয়েছেন যাঁরা প্রথম সারির বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির উচ্চপদে কর্মরত।

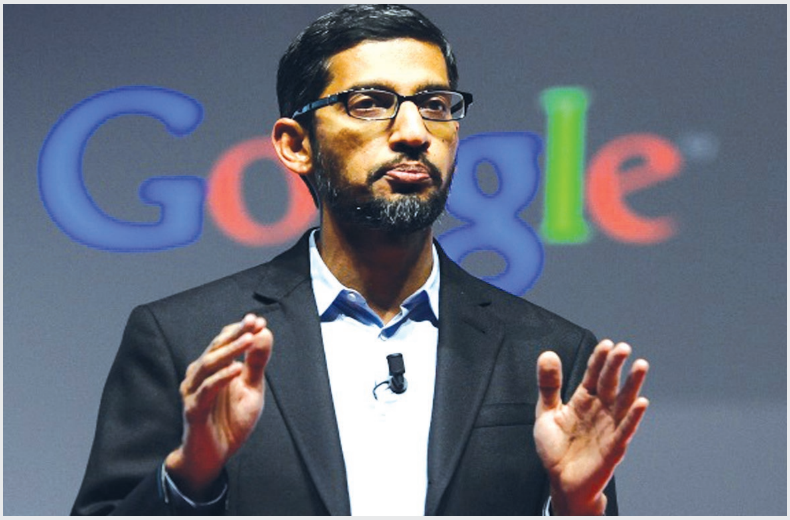

গুগল সিইও সুন্দর পিচাই।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত কৃতীদের সাফল্য সবচেয়ে বেশি ইউকে-তে। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁদের সাফল্য লক্ষ্য করা যায় আমেরিকাতেও। তাই বলা যায় ভারতীয় প্রতিভাশালীরা আজ বিশ্বে রাজ করছে। এ প্রসঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বরাক ওবামা বলেছেন, ''আমি চাই সংখ্যায় আরো বেশি ভারতীয় আমেরিকায় আসুক। তাঁদের আরো উন্নতি করতে আমরা সাহায্য করবো।'' ভারতীয় বংশোদ্ভূত সুন্দর পিচাই বর্তমানে ইউএস-এতে রয়েছেন। খড়্গপুর আই আই টি থেকে পাশ করে সম্প্রতি গুগলের সিইও পদে নিযুক্ত হয়েছেন তিনি। এরকম প্রথম সারির পাঁচটি কোম্পানির সিইও-দের মধ্যে প্রথম দু'টি কোম্পানির সিইও ভারতীয় বংশোদ্ভূত। এখানেই থেমে যায়নি, এরকম অনেক ভারতীয় প্রতিভাবান নাগরিক রয়েছেন যাঁরা গুগলের অন্যান্য শাখার প্রধান পদে বসেছেন। সুন্দর পিচাই-এর পর আরও একটি নাম সত্য নাদিলা। বর্তমানে তিনি মাইক্রোসফট-এর প্রধান। এছাড়াও রয়েছেন রাকেশ কাপুর (রেকিট বেঙ্ককিজার), শান্তনু নারায়ণ (অ্যাডব), অজয়পাল সিং বাঙ্গা (মাস্টার কার্ড), ইভান নেনেজেস (ডিয়েগো), সঞ্জয় মেহরোত্রা (স্যান ডিস্ক) প্রমুখ।

এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম ধনী লক্ষ্মী মিত্তল, বিশ্বের অন্যতম এক সিইও মুকেশ অম্বানি। বেদান্তের অনিল আগরওয়াল বা বেঙ্কট রামকৃষ্ণন যিনি আবার রসায়ন নিয়ে কাজ করে নোবেল পুরস্কারও পেয়েছেন। বেঙ্কট রামকৃষ্ণন ছাড়াও আরও দু'জন ভারতীয় বংশোদ্ভূত চন্দ্রশেখর এবং খুরানা বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করে নোবেল পুরস্কার পান।

বর্তমানে ম্যাকনানের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হয়েছেন প্রসুন যোশী। আবার বিনীতা গুপ্তাকে ইউ এস সিভিল রাইটস ডিপার্টমেন্টে এনেছেন ওবামা। ইউনিলিভারের প্রাক্তন প্রশাসক হরিশ মারওয়ানি সদ্য যোগদান করেছেন ব্ল্যাকস্টোন কোম্পানির গ্লোবাল এক্সিকিউটিড অ্যাডভাইজার হিসেবে। সুতরাং যতদিন যাচ্ছে বিদেশের মাটিতে ভারতীয়দের কদর ক্রমশ বেড়েই চলেছে। তবে পিছিয়ে নেই ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্ষুদেরাও। ক্যালিফোর্নিয়ার বাসিন্দা প্রবাসী বাঙালি শুভম ব্যানার্জী সবচেয়ে কম দামের উন্নতমানের প্রিন্ট ব্রেইল মেশিন তৈরি করেছে। বর্তমানে এই নিয়ে একটি সংস্থাও খুলেছে সে। আবার গুজরাটের ভাপির বাসিন্দা ১৩ বছরের গ্রন্থ থাক্কার সম্প্রতি বিশ্বের দ্রুততম মেন্টাল ক্যালকুলেটর অবিষ্কার করে। এরকম ২৫ জনের নাম 'দ্য টাইম' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। যাঁরা প্রত্যেকে ভারতীয় বংশোদ্ভূত।

সারা বিশ্বে ভারতীয় প্রতিভাবানদের প্রভাব বাড়ছে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নিজের মাতৃভূমিতে যোগ্য পরিকাঠামো তাঁরা পাননি। অথচ এই উদীয়মান প্রতিভাবানদের কাজে লাগিয়ে সহজেই ভারতের উন্নতি করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে ইনফোসিসের প্রধান এস. নারায়ণ মূর্তি আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, ''ভারত গত ৬০ বছরে উচ্চ মেধাকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ''। ভারত সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ''ভবিষ্যতে সারা বিশ্বের কাছে ভারত জ্ঞানের ভাণ্ডার হিসাবে পরিচিতি লাভ করবে।'' সেটাই এখন করে দেখাচ্ছে ভারত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে সমস্ত দেশে সফর করছেন সেখানকার ভারতীয়দের সঙ্গে দেখা করছেন এবং নিজেদের মাতৃভূমির প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আর্জি জানাচ্ছেন। গত ৬৮ বছরে কোনো প্রধানমন্ত্রী যে ডাক দেননি তা করেছেন নরেন্দ্র মোদী। মোদীর এই আহ্বানে আপ্লুত ভারতীয় বংশোদ্ভূতরাও। বর্তমানে আমেরিকার সিলিকন ভ্যালির তিন ভাগের একভাগ ইঞ্জিনিয়র ভারতীয় বংশোদ্ভূত। অর্থাৎ ভারতীয় পরম্পরাকে ধরে রাখতে এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রবাসী ভারতীয়দের মাতৃভূমির প্রতি দায়বদ্ধ থাকা উচিত বলে সমাজের একাংশ মনে করেন। ■

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
7 December - 2015 - Rs. 10.00

দাম : ১০.০০ টাকা